আমাদের দেশে লাউ কুমড়া প্রভৃতির চারা গাছের পোকা মারিবার জন্য হুঁকার জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। তামাকের ধূম হুঁকার জলের ভিতর দিয়া যায় বলিয়া তামাকের কতকটা বিষ জলের মধ্যে থাকিয়া যায়। সেই বিষের প্রভাবে ছোট ছোট পোকা মরিয়া যায়।

ধূম, নস্য, দোক্তা, জরদা প্রভৃতি যেরূপেই ব্যবহৃত হউক তামাক শরীরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। তবে ব্যবহারের পার্থক্যে অনিষ্টের তারতম্য ঘটে মাত্র। যেমন সিগারেটের পরিবর্ত্তে হুঁকার তামাক খাইলে হুঁকার জলে কতকটা বিষ থাকিয়া যায় বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্ট হইয়া থাকে।

তামাকের অপকারিতা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ পরীক্ষা দ্বারা যে সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন, নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

দীর্ঘকাল তামাকের ধূম পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠে বায়ু সঞ্চয়, বিবিধ বায়ু রোগ, শিরোরোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অধ্যাপক জে, রসিওয়েলার বলেন যে,—তামাকে নানাপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে। তন্মধ্যে নিকোটিন নামক মারাত্মক বিষ প্রধান। নিকোটিন শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। উহা ধমনী (Nerve) সকলকে দুর্ব্বল করে এবং ক্রমে অকর্ম্মণ্য করিয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপন্ন করে। নিকোটিন—হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার বিকৃতি, হৃদয়ের স্পন্দন (Palpitation) পাকস্থলীর ক্রিয়ার ব্যাঘাত, অজীর্ণ রোগ এবং কম্পন রোগ জন্মায়, উহার দ্বারা চক্ষুর তারা বিস্তৃত হয়, দৃষ্টিশক্তির অল্পতা ঘটে এবং কর্ণে নানাবিধ যন্ত্রণাপ্রদ শব্দ উৎপন্ন হয়।

ডাক্তার রিচার্ডসন বলিয়াছেন যে, ক্রমাগত তামাক ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক রক্তশূন্য ও ফেকাশে হয়, পাকস্থলীতে রক্তবর্ণ অঙ্কুর সকল উৎপন্ন হয়, রক্ত অত্যন্ত তরল হইয়া ফুস্‌ফুস্ ফেকাশে হয় এবং হৃদযন্ত্র অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ডাক্তার জে, এচ, কোসগ এম, ডি, বলিয়াছেন যে, প্রুসিক এসিড ব্যতীত এমন কোন বিষ নাই, যাহা যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ৩।৪ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। আধ সের তামাকে এত অধিক বিষ আছে, যে, যদি সেই সমস্ত বিষ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তিন শত মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে। একটী চুরুটের বিষে দুইজন মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। পক্ষী, ভেক এবং ক্ষুদ্র জীব দিগের তামাকের ধূম পূর্ণ রুদ্ধ স্থানে রাখিলে শীঘ্রই মরিয়া যায়। সুতরাং তামাক যে ভয়ানক বিষ তাহার সন্দেহ নাই।

ডাক্তার আলি, এফ, আর, এস বলেন যে, অস্বাস্থ্যকর এবং ম্যালেরিয়া পীড়িত স্থানের অধিবাসীদিগের মুখ পাংশুবর্ণ হয়, শরীর সম্যক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না এবং মাংস পেশী সমূহ দুর্ব্বল হইয়া থাকে। উহারা বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু মনুষ্যোচিত জীবনী শক্তির (Vitality) অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া। তামাক ব্যবহারে অভ্যস্ত ব্যক্তিদিগেরও শরীরের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে।

ডাক্তার জে, এচ, কেলগ্ এম, ডি, বলেন,—

তামাক ব্যবহারে রক্ত যে কেবল খারাপ হয় তাহা নহে, পরন্তু রক্ত বিষাক্ত হয় এবং রক্ত-স্থিত রক্তবর্ণ অণু সকল কমিয়া যায়।

অধ্যাপক রসিওযোনার বলেন যে, চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অত্যধিক পরিমাণে তামাক ব্যবহার করিলে কণ্ঠদেশে একপ্রকার ক্ষত হয় এবং উক্ত ক্ষত প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে।

লণ্ডনস্থ মেট্রপলিটন ফ্রি হাঁসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার সি, আর ড্রাইস-ডেল "পবলিক হেলথ" নামক পত্রে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, অল্প বয়সে তামাক খাওয়ার ফলে অনেক সময় ক্ষয়রোগ হইয়া থাকে।

তামাক ব্যবহার করিলে গ্যাষ্ট্রীক ফুসের ক্ষরণ কমিয়া যায় এবং পাকস্থলীর কার্য্য কারিতা শক্তির হ্রাস হয়। নস্য ব্যবহারের ফলেও অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে।

তামাক ব্যবহারের ফলে একপ্রকার পক্ষাঘাত রোগ জন্মে। তামাকের বিষে ধমনী বিতানের (Nervons system) অত্যন্ত বিকৃতি ঘটে। তাহার জন্য তামাক-সেবী দিগের কেহ সহজে চমকিয়া উঠে, কেহ অত্যন্ত খিটখিটে হয়, কাহারও হাত কাঁপিতে থাকে, কাহারও রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। এইরূপ আরও আরও উপসর্গ ঘটে। বিশেষতঃ নেত্র ধমনী (Optic nerve) একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আজ কাল লোকের যে অনেক বয়সেই দৃষ্টিক্ষীণতা ঘটিতেছে, তামাক ব্যবহার তাহার একটী প্রধান কারণ।

তামাক ব্যবহারে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং হৃদয়ের স্পন্দন (Palpitation), নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি উপসর্গ হয়। তামাকসেবীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, নাড়ীর গতি এবং বল হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, হৃদ্‌যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

তামাকের ধূমে ফুসফুসের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। তামাক ব্যবহারকারীর শরীর সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। ডাক্তার এচ, বি টিকানী বলেন যে, ইহা দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষয় হয়, মন নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, হিতাহিত জ্ঞান কমিয়া যায় এবং চরিত্র দূষিত হইয়া থাকে। ডাক্তার এল্, জি, আলেকজাণ্ডার বলেন যে, তামাক ব্যবহার-কারীর সন্তানগণ তামাকে অত্যন্ত আশক্ত হইয়া থাকে এবং উহারা দুর্ব্বল শরীর, চরিত্র হীন এবং বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তামাক সুস্থ শরীরে বিষবৎ অনিষ্ট-কারী, সুতরাং সুস্থ শরীরীর পক্ষে তামাক ব্যবহার করা উচিত নহে। অনেক তামাক সেবী কিন্তু ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, একদিকে রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান যেমন তামাককে বিষ বলিয়া প্রতি-পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, অপরদিকে লক্ষ লক্ষ তামাকসেবী সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিয়া তামাকের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতেছে। তামাকে যদি প্রকৃতই পূর্ব্বকথিত রূপ অনিষ্ট হইত, তাহা হইলে কখনই এত লোক সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিত না।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই কিন্তু তামাকসেবীদিগের এই যুক্তির অসারত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মনুষ্য শরীর এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত—যে কোন বিষই শরীরে প্রবেশ করুক সহজে শরীরের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না এবং অভ্যাস করিলে মারাত্মক বিষও সহ্য হইতে পারে। অনেক লোক এত আফিম খায়, যে তাহাতে তিন চারজন আফিম সেবনে অনভ্যস্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া অহিফেন যে মারাত্মক বিষ নয় এরূপ বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিষ সদ্যোমারাত্মকও আছে, আবার বহুকালে প্রাণ নষ্ট করে এমন বিষও আছে। তামাক সেবন না করিলে যে ব্যক্তি সুস্থ, সবল ও নীরোগ শরীরে সত্তর বা আশী বৎসর বাঁচিতে পারিত, সে ব্যক্তি তামাক সেবনের ফলে দুর্ব্বল দেহে রোগ ভোগ করিয়া পঞ্চাশ কি ষাট বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—এই অকালমৃত্যু তামাক বিষের ফলেই বলিতে হইবে। কেবল তামাক বলিয়া নহে—সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্যসেবীদিগের অকালমৃত্যু, রোগভোগ এবং দৈহিক ও মানসিক অবনতি সেই মাদক দ্রব্যেরই কার্য্য।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন চিকিৎসকের টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ। *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র লাহিড়ী।

বমন নিবারণে—এক ছটাক চিনির সরবতে দশ বারটী কচি আমের পাতা বাটিয়া সেই রস ঐ সরবতের সহিত মিশাইয়া পান করিলে বমন নিবারণ হয়।

হিক্কায়—দ্রোণপুষ্পের (গলঘসিয়া ফুল) কচি শিকড় ১টী, আদা ৩ খণ্ড—একত্র বাঁটিয়া ৩টী বটীকা প্রস্তুত করতঃ দিনে ৩ বার ঠাণ্ডা জলসহ সেব্য।

প্রবল হিক্কায়—পেঁপের আঠা ৩।৪ ফোঁটা—/০ ছটাক শীতল জলের সহিত খাইলে প্রবল হিক্কা বন্ধ হয়। অথবা বর্ষা ঋতুতে যে সমস্ত বাঁশের খুটায় জল আবদ্ধ অবস্থায় থাকে, সেই জল হিক্কাগ্রস্ত রোগীকে পান করাইলে যে কোনপ্রকার হিক্কা হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

বাঘীতে—ভেলার আঠায় নেকড়া ভিজাইয়া তাহার উপর অল্প পরিমাণে কলিচুণ মিশাইয়া বাঘীর উপর পটি দিলে বাঘী বসিয়া যাইবে। অথবা পালিধা মাদারের আঠা বাঘীর উপর প্রয়োগ করিলেও বাঘী বসিয়া যাইবে।

টাকে—টাকের উপর যদি ২।১ গাছি

* প্রাচীন চিকিৎসক ৺জয়রাম লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যবহৃত।

চুল থাকে তাহা কামাইয়া সেইস্থানে পরিষ্কার চিনি ও ছোট পেঁয়াজ, অথবা লাল জবাফুল কিম্বা লাল লঙ্কা মরিচ প্রতিদিন ৩।৪বার ঘর্ষণ করিলে আবার চুল উঠে।

ফোড়ায়—ন'টের মূল, রক্তচন্দন, গব্যঘৃত এবং শিমুলের কাঁটা সমান অংশে লইয়া বাটিয়া লাগাইলে ফোড়া আপনা হইতেই পাকিবে ও ফাটিয়া যাইবে। অথবা শুধু ন'টের মূল বাটিয়া ফোড়ার উপর স্থাপনকরতঃ সেই মূল বাটার উপর একটী মটরের দাইল বসাইয়া দিলেও ফোড়া পাকিবে। অথবা গরুর দন্ত ঘষিয়া লাগালেই ফল হইবে।

আমাশয়ে—পুরাতন তেঁতুল ৵০ ছটাক, এক পোয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল লবণ-সংযুক্ত করিয়া ৵০ আনা খদির প্রক্ষেপ করতঃ সেবন করিলে ফল হয়। অথবা কাঁচা মিঠা আমের ছাল ও কাল জামের ছাল সম পরিমাণে লইয়া তাহার রস ২ তোলা (গরম) মধু ও জিরাভাজার চূর্ণসহ সেবন করিলে প্রবল আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

অর্শে—মনসা-সীজের আঠা ও হরিদ্রা চূর্ণ সমানাংশে লইয়া প্রলেপ দিলে বলি খসিয়া পড়ে, ক্ষতও আরোগ্য হয়। তিল, ভেলা, হরীতকী ও ইক্ষু গুড় সমভাগে লইয়া সেবন করিলে অন্তর্ব্বলী নিরাময় হয়।

পোড়া ঘায়ে—দগ্ধ হইবামাত্র চূণের জল, লঙ্কা গাছের পাতা ও নারিকেল তৈল সমপরিমাণে লইয়া দগ্ধ স্থানে লাগাইলে দগ্ধ স্থানের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয় এবং ক্ষতও আরোগ্য হয়। অথবা বেগুন গাছের পাকা পাতা অগ্নিতে ভস্ম করিয়া মধুসহ ক্ষতস্থানে দিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। অথবা ভাত পোড়াইয়া চূর্ণকরতঃ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে ক্ষত নিরাময় হয়, অথবা খড়ের ঘরের পচা খড় অগ্নিতে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত আরোগ্য [illegible] দগ্ধস্থানে গোল আলু বাটিয়া দিলে তা[illegible] যন্ত্রণার অবসান হই[illegible]ব। দগ্ধস্থানে ত[illegible] চূণ দিলে বেশ উপকার হয়। ডাবের [illegible] মাখন একত্র বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগা[illegible] ক্ষত শুকাইয়া যায়।

প্রদরে—(অত্যন্ত রক্তস্রাবে) রসাঞ্জন ও লাল ন'টের শিকড় সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া মসুর দাইল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুতকরতঃ মুর্ব্বা মূলের শিকড়ের রস ও চিনি সহ সেব্য।

প্লীহায়—হিরাকস ১ তোলা, মূলার বীজ ১ তোলা—গরম জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটি প্রাতে ও সন্ধ্যায় গুলঞ্চের রস ও চিনি সহ সেব্য।

পাঁচড়ায়—মাখন ও গন্ধক সম পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

পুরাতন জ্বরে—ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, গুলঞ্চ ২ তোলা—কলার পাতে বেষ্টন করিয়া রাত্রে পোড়াইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে ঐ রস মধুসহ সেবন করিলে পুরাতন জ্বরে উপকার হয়।

উন্মাদে—১ তোলা কর্পূর—পাথরের বাটিতে মহিষ শৃঙ্গ দ্বারা ১ ঘণ্টাকাল বাটিয়া ঐ কর্পূর রোগীর মস্তকে প্রলেপ দিতে হইবে। ঔষধ মাথায় দিলে রোগীর বেশ নিদ্রা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে—শতধৌত গব্যঘৃত ৵০ পোয়া, তুতে ভস্ম ।০ আনা—একত্র মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ ঔষধ কলা অথবা [illegible] সঙ্গে খাইতে হইবে। ঔষধ সেবন-কালে ঔষধ যেন দন্তে না স্পর্শিত হয়।

[illegible]াতের বেদনায় এবং [illegible]য়—আদা, লঙ্কা মরিচ, সজিনা ছাল, রসুন, ও ওকড়া শাক সমভাগে জল দিয়া বাটিয়া গরম করতঃ বেদনায় ও ফুলার স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে।

সর্দ্দিতে—ছোট পেঁয়াজ, আতপ চাউল, ও সোরা সমভাগে লইয়া একত্রে জল দিয়া বাটিয়া সামান্য গরম করতঃ বক্ষে প্রলেপ দিলে সর্দ্দি উঠিয়া যাইবে।

প্রমেহে—ছোট আমগাছের ছালের রস ।০ ছটাক—চূণের জল ।০ ছটাক একত্র মিশাইয়া সেবন করিতে হইবে। ঔষধ মিশাইয়াই সেবন করা দরকার, নতুবা জমিয়া যাইবে। ২।৩ দিন সেব্য।

প্রদরে—ওলট্‌কম্বলের শিকড়ের ছাল ৵০ আনা হইতে ।৵০ আনা পর্য্যন্ত ৫টা গোলমরিচ দ্বারা বাটিয়া সেবন করিলে অতিস্রাব বন্ধ হয়। ৩।৪ দিন ব্যবহার করিতে হইবে।

রক্তস্রাবে—শ্বেতআকন্দের মূলের ছাল ২টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া সেবন করিতে হইবে।

মলমূত্র বন্ধে—মলমূত্র বন্ধ হইয়া পেট ফুলিয়া গেলে একটী জায়ফল জল দ্বারা ঘসিয়া পুরাতন ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নাভীর চারিদিকে প্রলেপ দিতে হইবে। *

স্বপ্নদোষে—হরীতকী, আমলকী, বিল্বপত্র, কালজিরা সমভাগে লইয়া কাঁচা দুগ্ধ সহ সন্ধ্যার পর সেব্য।

হিক্কারোগে—সোমরাজী বীজ চূর্ণ ও হরিদ্রা চূর্ণ সমভাগে চূণের জলের সঙ্গে সেবন করিতে হইবে।

সুপ্রসবের উপায়—হাতীশুড়ার মূল গর্ভিনীর বামদিকের কোমরে বাঁধিয়া দিলে সুপ্রসব হইবে। প্রসবান্তে মূলটি খুলিয়া দিতে হইবে।

পারদ জন্য ক্ষতে—তুলসী পাতা ৪ তোলা পরিমাণ দুই সপ্তাহ চর্ব্বণ করিয়া খাইলে ক্ষত নিরাময় হয়।

ঋতুবন্ধ হইয়া গর্ভ সদৃশ হইলে—চামেলী ফুলের পাতা ।০ পোয়া, জল ।৮ সের শেষ ।২ সের থাকিতে নামাইয়া ঐ জল ।৵০ ছটাক করিয়া প্রত্যহ ২ বার সেব্য। ৩।৪ দিন খাইলে পেটের জল বাহির হইবে।

ধ্বজভঙ্গে—একখানা ছোট নেক্‌ড়ায় পালিধা মাদারের আঠা ৭ বার মাখাইয়া

---

* এই মুষ্টিযোগটি কিন্তু আমাদের মতে কেমন কেমন ঠেকিতেছে, কারণ জায়ফলের গুণ মলের বিবদ্ধভাব সংঘটন, এইজন্য প্রবল অতিসারে নাভির চারি পার্শ্বে জায়ফল ঘসিয়া প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা আছে। মল বন্ধ হওয়ার জন্য যাহাদের পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে তাহাদিগের ইহাতে কি করিয়া ফল হইবে? আমাদের বোধ হয় উহাতে আরও বিপরীত হইতে পারে। তবে ইহা একজন প্রাচীন চিকিৎসকের খাতায় লিখিত বলিয়া আমরা ছাপিলাম। আং সং।

শুখাইতে হইবে পরে জায়ফল চূর্ণ ও লবঙ্গ চূর্ণ মাখাইয়া সন্ধ্যার সময় পুরুষাঙ্গে পটী বাঁধিতে হইবে এবং সমস্ত রাত্রিই বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

রক্ত প্রদরে—বাসকের ছাল ২ তোলা, জল ৵৷৷০ সের দ্বারা জ্বাল করতঃ ৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ফটকারী, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, রসাঞ্জন, পদ্মকেশর, ও অশোকের ছাল চূর্ণ, প্রত্যেক ৫ রতি সহ ২ বেলা সেব্য। ৭ দিন ব্যবহারে রক্ত প্রদর আরোগ্য হয়।

শোথে—সোরা ১ তোলা, শোধিত গন্ধক ১ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া এক-লোহার হাতায় অগ্নিতে জ্বাল দিতে হইবে। যখন ঔষধ হাতার উপর জ্বলিয়া উঠিবে তখন তাহা একটি মাটির পাত্রে ঢালিয়া রাখিতে হইবে এবং ঠাণ্ডা হইলে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। সেই চূর্ণ ১ রতি পুনর্ণবার রস সহ সেব্য।

রক্তপিত্তে—চুকাশাকের মূল ৩ তোলা, মৌরী ১ পোয়া, চিনি ২ তোলা, মৌরী বাটিয়া চুকাশাকের মূলের রসে চিনি সহ সরবতৎ করতঃ সেবন করিলে বুকের ভার ও রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়।

দদ্রুরোগে—কর্পূর ১ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, গর্জ্জন তৈল ১ পোয়া, একত্র মর্দ্দন করতঃ দদ্রু স্থানে প্রযুজ্য।

রক্তপ্রদরে—কাঁচা আদা ৵০ আনা, বেলছাল চূর্ণ ১ পোয়া—একত্র বাটিয়া অশোকের ছালের রস সহ খাইতে হইবে।

অধিক প্রসাবে—কাঁচা ডুমুর ১৫টী ছেঁচিয়া সেই রস, চিনি ২ তোলা, জল ৵০ পোয়া—সরবৎ করতঃ সেবন করিতে হইবে।

পেটফাঁপায়—গোলমরিচ ৬ ৭টী চূর্ণ করিয়া মিছরির সরবৎ সহ সেব্য।

ক্রিমিরোগে—পলাশবীজ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও কুমড়ার বীজ (মিষ্ট) প্রত্যেক ৷৷০ তোলা, জল ৵৷৷০ সের দিয়া সিদ্ধ করিয়া ৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ ২ তোলা বিড়ঙ্গের চূর্ণ সহ ২ বার দিনে সেব্য।

অরুচিতে—পাকা জামের রস ৵৷৷০ সের, মিছরি ৷০ পোয়া—একটী মাটির পাত্রে জ্বাল দিয়া মিছরি গলিয়া গেলে গোলাপ জল ২ তোলা মিশাইতে হইবে। প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে ১ তোলা সেব্য।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে—শতধৌত গব্যঘৃত ৵০ পোয়া মুদ্রা শঙ্খ ৵০ ছটাক, সফেদা ৵০ ছটাক, ১ প্রহর খলে মাড়িয়া কর্পূর ৩ তোলা মিশাইয়া ক্ষতে লাগাইতে হইবে।

পিত্তজন্য হাত পা জ্বালা করিলে—বিটলবণ, গোলমরিচ, সোহাগার খৈ প্রত্যেক ৩ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ২।৩ রতি মুখে দিয়া মিছরির সরবৎ খাইতে হইবে।

উপদংশে ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে—গব্যঘৃত ৵৷৷০ সের লইয়া নিমের পাতা ও নিসিন্দার পাতা ও অপামার্গের মূল ১টী ঐ ঘৃতে ভাজিয়া ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া ফিট্‌কিরির খৈ ৷৷০ তোলা, তুঁতে ভস্ম ।০ চারি আনা মিশাইতে হইবে। ক্ষতে এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

বিষ ভক্ষণে—কলমী শাকের ডাঁটা ও পাতার রস ১৵০ পোয়া রোগীকে খাওয়াইতে হইবে, তাহা হইলে রোগীর বমি হইয়া বিষ উঠিয়া যাইবে।

হিক্কায়—আনারসের পাতার রস ১৵০ পোয়া, মিছরি ১ তোলা সহ সেব্য।

আমাশয়ে—বাবলা গাছের পাতা, থানকুনী শাকের পাতা ও সামান্য অহিফেন একত্র বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে আমাশয়ের জন্য পেট ব্যথায় উপকার হয়।

রাত্রিতে চক্ষুতে না দেখায়—পানের রস ২।৩ ফোঁটা চক্ষে দিতে হইবে। পরে ৫।৬ মিনিট চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকার পর ঠাণ্ডা জল দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করিতে হইবে। একদিনেই উপকার হয়। ঘোটকের বিষ্ঠা (সদ্য) এক খানা পরিষ্কার নেকড়ার পুঁটুলী করিয়া চক্ষুতে সেই বিষ্ঠার রস ১ ফোঁটা করিয়া দিলেও বেশ ফল হয়। শনি মঙ্গলবারে একটী জোনাকী পোকা একটী কলার ভিতর ভরিয়া যে স্থানে ৩টী রাস্তা মিলিয়াছে সেইরূপ স্থানে রোগীকে সন্ধ্যার পর সেই জোনাকী ভরা কলা খাইতে দিতে হইবে, রোগী কলা খাইয়াই চক্ষুতে দেখিতে পাইবে। *

রক্তপ্রদরে—শ্বেত আকন্দের মূল ২ তোলা, গোলমরিচ ॥০ তোলা—বাসি জলে বাটিয়া সেবনে ফল পাওয়া যায়।

ক্ষতে—শ্বেত কাঞ্চন ফুল ১০টী, নিমপাতা বাটা ২ তোলা—একত্র বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ।

শিশুর উদরাময়ে—লবঙ্গ, জায়ফল, ও সোহাগার খৈ প্রত্যেকটি সমভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া মাতৃদুগ্ধ সহ সেবন করাইলে ফল পাওয়া যায়।

বাঘী বসান—হিরাকস ভিজান জলের পটী দিলে বাঘী বসিয়া যায়। (২) কালকুকুটির ডিম ১টা কাঁসার থালে ভাঙ্গিয়া চূণ সামান্য দিয়া উত্তমরূপে ডিমের লালার সহিত মিশাইতে হইবে, এই ঔষধ দিবসে ৩।৪ বার প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়।

অম্লরোগে—প্রতিদিন গুঁড়া চা খড়ি ১০।১২ বার—১ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। রোগ উপশমিত হইলে ক্রমে ক্রমে মাত্রা কমাইতে হইবে।

প্রমেহে—স্নানকালে সাত খণ্ড আদা ও এক খণ্ড আসসাওড়ার (যাহা সকলে দন্ত ধাবনার্থ ব্যবহার করে) মূল একত্রে মুখের মধ্যে দিয়া জলে ডুব দিয়া চিবাইয়া খাইতে হইতে হইবে। পরিশেষে স্নানান্তে দধি, কদলী সহ অন্ন ভোজন। এই প্রক্রিয়া করিলে প্রমেহ আরোগ্য হয়। (২) কৃষ্ণ তুলসীর পাতার রস বিনা জলে বাহির করিতে হইবে। সেই তুলসীর রস ১ তোলা—টাট্‌কা মধু ১ তোলা, খাঁটি গব্য দুগ্ধ ১ তোলা—একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে যেমন কঠিন ব্যাধি হউক না কেন নিশ্চয়ই ফল হইবে। প্রমেহ অধিক দিনের হইলে এক পক্ষকাল অথবা ৩ সপ্তাহ

* শনি মঙ্গল বারে এবং যেস্থানে তিনটি রাস্তা মিলিয়াছে, সেরূপ ব্যবস্থায় জোনাকী থাওয়ার কথা আমরা জানিনা, তবে জোনাকী—কলার ভিতরে পুরিয়া খাইলে যে এরূপ অবস্থায় ফল পাওয়া যায়, তাহা আমরাও কয়েক স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আং সং।

সেবন করিতে হইবে। (৩) একটী পুঁই শাকের মূল /১ পোয়া জলের সহিত বাটিয়া স্নানান্তে খাইতে হইবে। পরে ভিজান কাঁচা কলাইয়ের দাইল চিনির সহিত সেবন করিতে হইবে। এই প্রকার ৩ দিন করিলে রোগ আরোগ্য হইবে।

সহজ হিক্কা নিবারণে—একটী পাতি অথবা কাগজী লেবুর একদিক কাটিয়া তাহা সূঁচ দ্বারা বার বার বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মিছরির গুঁড়া দিতে হইবে। সূঁচ এরূপ ভাবে বিদ্ধ করিতে হইবে যে, সেই সূচী বিদ্ধ কালে ছিদ্র পথে যেন মিছরি প্রবেশ করে। এইরূপে লেবুটী প্রস্তুত করিয়া রোগীকে লেবু চুষিতে হইবে। হিক্কা কালে রোগী সেই লেবুটীর কর্ত্তিত মুখে মুখ দিয়া অল্পে অল্পে চুষিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

পালা জ্বরে—হাতিশুঁড়োর পাতার রসে একখানি ছিন্ন বস্ত্র সিক্ত করিয়া ছোবড়া গুলি সেই বস্ত্রের এক প্রান্তে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। পরে সেই পুঁটুলীর ঘ্রাণ পুনঃ পুনঃ লইতে হইবে, পালার ২।৩ দিন এই ঔষধের ঘ্রাণ লইলে পালা নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে।

হৃৎপিণ্ডের হাঁপছাড়া।

["হিন্দুস্থান হইতে সংগৃহীত"]

মানুষের দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ডই হইতেছে সব-চেয়ে বড় জিনিষ; কিন্তু তাহার সঠিক বৃত্তান্ত আমরা একরকম জানিনা বলিলেও চলে।

দেহের রক্ত সর্ব্বপ্রথমে হৃৎপিণ্ডের চারিটি কুঠরী; তারপর শরীরের ছোট-বড় ধমনীর ভিতরে ঘুরিয়া, একবার ফুসফুসের মধ্যে গমন করে। তা'রপর আবার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ফিরিয়া আসে। আমাদের দেহের ভিতরে ক্রমাগত এমনি রক্তের আসা যাওয়া চলিতেছে। দেখা গিয়াছে, এমনি করিয়া প্রতেকবার সারা দেহটা ঘুরিয়া আসিতে রক্তের পক্ষে আধ মিনিটের বেশী সময় লাগে না।

মানুষ যখন দাঁড়াইয়া থাকে তখন তাহার হৃৎপিণ্ড যতবার স্পন্দিত হয়, যখন সে শুইয়া থাকে তখন তাহার হৃৎপিণ্ড তা'র চেয়ে দশবার কম স্পন্দিত হয়। মানুষ যখন হাঁচে, হৃৎপিণ্ডের গতি তখন বন্ধ হইয়া হইয়া। একজন বিশেষজ্ঞের মতে, হৃৎপিণ্ডের কাজের হের-ফেরের দরুণই মানুষের মুখ ক্ষণিকের জন্য পাণ্ডুবর্ণ বা লজ্জার সময়ে লাল হইয়া উঠে। চৌকাডগা আঙ্গুল হৃৎপিণ্ডের দোষ-নির্দ্দেশক। যাহার উদরের পরিপাক কারী যন্ত্রগুলি ও ফুসফুসের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের আকারও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়, সে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে এমনি আরও অনেক জানিবার কথা আছে,

সাধারণতঃ সকলের যাহা জানা নাই। আপন আপন দেহ সম্বন্ধে সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান-সঞ্চয় করা উচিত। তাই এখানে আমরা হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে আরও কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিব।

শ্রান্তি কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই তাহা জানেন। দেহের মাংসপেশীগুলিকে বেশীক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলেই মানুষের শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়ে। মাংসপেশীর মধ্যে শ্রম-বিষ সঞ্চারিত হইলে মানুষের মনে যে শ্রান্তির ভাব আসে, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলেই সে ভাবটা চলিয়া যায়। কার্য্যের সময়ে মাংসপেশী যে সার পদার্থ ব্যয় করে, বিশ্রামের সময়ে সে আবার সেটা পরিপূরণ করিয়া নেয়।

এই শ্রান্তির ভাবটা বেশ আরামের না হইলেও, এটা না থাকিলে আমরা কিছুতেই বাঁচিতাম না। কারণ, তাহা ছইলে আমরা এমন ভীষণ পরিশ্রম করিতাম যে, আমাদের সমস্ত মাংসপেশী একেবারে নিঃশেষে ক্ষয়লাভ করিত! কিন্তু ভাগ্যে শ্রান্তি আসিয়া আমাদিগকে আগেই সাবধান করিয়া দেয়।

দেহের সমস্ত মাংস মাংসপেশীর ধর্ম্মই এক,—কেবল হৃৎপিণ্ড ছাড়া। এখানে বলিয়া রাখা ভালো, আসলে হৃৎপিণ্ড মাংসপেশী ভিন্ন আর কিছুই নহে। দিনে-রাতে হৃৎপিণ্ড যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াও সতেজ-সবল থাকে, অন্য যে কোন মাংসপেশীর পক্ষে সে পরিশ্রমটা নিশ্চিত মরণের মতই সাংঘাতিক।

কিন্তু আপনারা অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, হৃৎপিণ্ডও তাহার কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত ভাবে বিশ্রাম করিয়া নেয়! হৃৎপিণ্ডের বিশ্রামের নামান্তর মৃত্যু—এই কথাই আমরা জানি। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের বিশ্রামের মধ্যে বেশ একটু নিপুণতা আছে এবং সেই জন্যই সে বিশ্রাম করিলে আমরাও চির-বিশ্রাম লাভ করি না।

নহিলে হৃৎপিণ্ডের ঢুপঢুপুনি যদি অল্পক্ষণের জন্যও বন্ধ হয়, তবে আমাদের পক্ষে সত্য-সত্যই বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

গড়পড়তার হিসাবে, উপবিষ্ট অবস্থায় প্রত্যেক পুরুষের হৃৎপিণ্ড মিনিটে বাহাত্তর বার এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোকের হৃৎপিণ্ড মিনিটে আশীবার করিয়া স্পন্দিত হয়। এমন মানুষ দেখা যায়, যাহার হৃৎপিণ্ড মিনিটে পঞ্চাশ বারেরও বেশী স্পন্দিত হয় না। এখন ভাবিয়া দেখুন, দিন-রাতে অশ্রান্তভাবে এই বিষম পরিশ্রমটা করিতে হইলে কতখানি শক্তি-সামর্থ্যের দরকার। এত বেশী পরিশ্রম করিতে হইলে, যে শক্তি ব্যয় হয়, সেই শক্তি-বলে প্রতিদিন পৃথিবীর গভীরতম খনি হইতে একখানি চারি সের ওজনের পাথরকে অনায়াসে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় একবার করিয়া তুলিয়া ফেলা যায়।

সুতরাং হৃৎপিণ্ডেরও বিশ্রাম দরকার। কিন্তু সে কি করিয়া বিশ্রাম নেয়, জানেন? আপনি যদি কোন লোকের বুকের উপরে কাণ রাখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, হৃৎপিণ্ড একবার ঢুপ্ ঢুপ্ শব্দ করিতেছে, আর একবার থামিতেছে। এই যে থামা ইহাই হৃৎপিণ্ডের কষ্টার্জ্জিত বিশ্রাম। শরীরের মধ্যে একমাত্র হৃৎপিণ্ড ছাড়া আর কোন মাংসপেশীই এমনভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে

পারে না। তাহার এই বিশ্রাম অনেকটা একচোখ মুদিয়া ঘুমানোর মতন বটে, তবু এই বিশ্রাম কালের মধ্যেই হৃৎপিণ্ড আপনার কার্য্যের উপযোগী বল সংগ্রহ করিয়া লয়। এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম এবং দুই মুহূর্ত্ত কাজ—এইরূপে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মোট বিশ্রামের পরিমাণও বড় অল্প হয় না। এবং এই বিরাম না থাকিলে, অল্পদিনেই হৃৎপিণ্ড অচল হইয়া যাইত।

ডাক্তারের ডায়েরী।

স্বর্গীয় ডাঃ হেমচন্দ্র সেন মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত ও ডাঃ শ্রীজগবন্ধু গুপ্ত এল, এম, এস, কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

আজ এক অদ্ভুত রোগী পাইয়াছিলাম। লোকটার বয়স ৩০।৩২ হইবে, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-পূর্ণ। সে গরমীর ব্যায়রামে অনেকদিন হইতে ভুগিতেছে। প্রথমেই আসিয়া আমাকে বলিল—তাহার এক শত্রু তাহাকে পানের ভিতর করিয়া কাঁচা পারা খাওয়াইয়াছিল,—সেই জন্যই তাহার "পারার ঘা" হইয়াছে। কথাটা শুনিয়া আমার হাসি আসিল। আমি একজন ডাক্তার, লোকটা আমার সঙ্গেই প্রতারণা করিল! "পারার ঘা" কথাটাই নিরর্থক। অনেক লোক আছে—যাহারা নিজের পাপকে গোপন করিবার জন্য "পারার ঘা" কথাটার সৃষ্টি করিয়াছে! আবার এমন গুণধর পুরুষ আছেন, যিনি অম্লানবদনে বলিয়া ফেলেন—"অনেক ডাক্তারী ঔষধ খাইয়াছি—হয়ত তাহাতেই আমার দেহে পারা ফুটিয়াছে।" হায়! এই সকল প্রবঞ্চকেরা হয় ত জানে না—বিশুদ্ধ পারা শরীরে এক কণাও গৃহীত হয় না, পারায় শরীরের কোনও অপকারই হয় না। বরং পারদ ঘটিত লবণ (Salt of mercury) দেহাভ্যন্তরে গৃহীত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুযায়ী লক্ষণ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু তাহাও কখন ও "ঘা" রূপে প্রকাশ পায় না। অধিকন্তু—পারার চেয়ে গরমীর ব্যায়রামের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। গরমীর ব্যারাম আরাম করিবার জন্য সরল প্রকৃতির ডাক্তার-গণ প্রকাশ্যে এবং চতুর ডাক্তারেরা গোপনে ঔষধরূপে পারাই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মূর্খ লোকে গরমীকে "পারার ঘা" বলুক, কিন্তু শিক্ষিত ডাক্তারেরাও যে (Mercurial Eruption) বলিয়া কথাটার ব্যবহার করেন, ইহা আমার অসহ্য।

* * *

যক্ষ্মারোগে—ছাগল।

ছাগল যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক। আমা-

দের পূর্ব্বপুরুষগণ—এ তথ্য জানিতেন। চরক ঋষি বলেন—"ছাগ মাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, ছাগলের সেবা, ছাগলের মধ্যে শয়ন—নিশ্চয় যক্ষ্মারোগ নষ্ট করে।" আমি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার ঔষধালয়ের ১ ক্রোশ দূরে এক মুসলমান যুবক বাস করিত। এ ব্যক্তি ধনী এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিল। ইহার যক্ষ্মারোগ হয়। আমি চিকিৎসা করি। ডাক্তারী কোন ঔষধে বিশেষ ফল না পাওয়ায়, আমি তাহাকে ছাগ-মাংস ভক্ষণ ও ছাগদুগ্ধ পান করিতে বলিলাম। তাহার শয্যার চতুর্দ্দিকে ৪।৫টা ছাগল বাঁধিয়া রাখিবার উপদেশ দিলাম। রোগী আমার আদেশ পালন করিল। ৪ মাসের পরে তাহার বক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—ক্ষয় রোগের চিহ্ন অন্তর্হিত হইয়াছে। ১ বৎসর রোগী আমার আদেশ পালন করিয়াছিল। ইহার পর ১১ বৎসর কাল আমি তাহার আর রোগ হইতে দেখি নাই। সেই অবধি চরকের উপর আমার বড়ই ভক্তি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে "চরক সংহিতা" একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, ভারতেরও গৌরবের জিনিষ। ইউরোপের একজন বড় ডাক্তার বলিয়াছেন,—"চরকের মতের চিকিৎসা প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবী হইতে অকাল মৃত্যু দূর হইত।" আমরা কিন্তু আজও চরকের আদর বুঝিলাম না!

* * *

সোডার চেয়ে "ভাস্কর লবণ" অনেক ভাল।

পাকস্থলীর ক্ষতে এবং অম্লাধিক্যে পূর্ব্বে আমি বাইকার্ব্বনেট সোডা—যথেষ্ট পরিমাণে জল মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিতাম। পীড়ার প্রবল অবস্থায় তাহাতে সাময়িক কিছু উপকার দর্শিত। কিন্তু এমন দুই চারিজন রোগী পাইয়াছি—যাহাদের সোডায় কোন ফল হয় নাই। ইহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা ছিল। প্রচুর মাত্রায় লাইট ম্যাগনেসিয়া ব্যবস্থা করিয়া ১০।১২ দিন ইহাদিগকে সুস্থ রাখিয়াছিলাম। পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অম্লত্ব নষ্ট করিতে হইলে—অধিক মাত্রায় ম্যাগনেসিয়া উপকারী। তবে কাহারও কাহারও সে উপকার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এরূপ রোগীকে—সবনাইটের অফ্ বিষমথ ২ ড্রাম মাত্রায় দিয়াছি। বিষমথ পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর আবরক হইয়া থাকে, সে জন্য খাদ্য দ্রব্য কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করিবার অবকাশ পায় না, পেপটিক গ্রন্থির স্রাব এবং কার্য্যকারিতা হ্রাস হয়। যখন দেখিলাম বিষমথের ক্রিয়াও বেশীদিন স্থায়ী হইল না, তখন কবিরাজী—"ভাস্কর লবণ" ব্যবস্থা করিলাম। রোগী বেশ ভাল হইয়া গেল। "ভাস্কর লবণ" একটী মহৌষধ। ইহাতে পাকস্থলীর রক্তস্রাব বন্ধ হয়, অন্ত্রের ক্রিমি দূর হয়, গ্রন্থির স্রাব কমিয়া যায়।

* * *

যে শিশু আন্ত্রিক অজীর্ণ রোগাক্রান্ত—তাহার সর্ব্ব প্রধান চিকিৎসা—কোন প্রকার উত্তেজনার কারণ না থাকে। তাহাকে আমোদ প্রমোদ শান্তি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার উত্তেজনা হইতে দূরে রাখিবে।

* * *

নিদ্রিতাবস্থায় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলে, অবসাদক [এণ্টিপাইরিন, সেনাসিটিন প্রভৃতি] বিশেষ উপকারী।

* * *

যে বালক অধিক বয়স পর্য্যন্ত শয্যায় মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে, তাহাকে বেলেডোনা উপযুক্ত মাত্রায় খাওয়াইবে। প্রথমে খুব অল্পমাত্রায় দিবে, পরে সহ্যমত মাত্রা বাড়াইবে।

বেলেডোনায় যক্ষ্মা রোগীর নিশিঘর্ম্ম নিবারিত হয়।

* * *

প্রদাহ—শরীরের অনিষ্টকারী নহে। বরং উপকারী। প্রদাহ—প্রকৃতির ক্ষমতার পরিচায়ক, শারীরিক অনিষ্ট নিবারণের জন্য —তীব্র প্রতিবাদ। অতএব প্রদাহ ক্রিয়াকে শরীর রক্ষার্থ সাহায্য করিতে হইবে।

কবিরাজী ঔষধে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য।

পাশ্চাত্য মতে কুষ্ঠ রোগের একটী মাত্র কারণ—Bacillus Lepra. আয়ুর্ব্বেদ মতে কুষ্ঠ রোগের কারণ অনেকগুলি—তন্মধ্যে খাদ্যের দোষ সর্ব্বপ্রধান। মৎস্য ও মাংসের বহুল ব্যবহারে কুষ্ঠরোগ জন্মিতে পারে—ইহা ঋষি-বাক্য। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুস্থানী বৈদ্যগণ কুষ্ঠরোগীকে নিরামিষ খাইতে এবং সাত্ত্বিক নিয়মে থাকিতে উপদেশ দেন।

আমি ৩টী কুষ্ঠ রোগী পাইয়াছিলাম। দুইজন মুসলমান, একজন হিন্দু মাড়োয়ারী। এই মাড়োয়ারী—কুষ্ঠরোগীর অনেক দিন ধরিয়া পরিচর্য্যা করিয়া কুষ্ঠাক্রান্ত হইয়াছিল। এই তিন জনের কুষ্ঠই—Cubercular leprosyর অন্তর্গত। তিন জনকে প্রায় একই সময়ে আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। কিন্তু মুসলমান দুইজন ভাল হয় নাই, মাড়োয়ারী ভাল হইয়াছিল। মুসলমান দ্বয় মাংস ও পলাণ্ডু ব্যবহার ছাড়ে নাই। মাড়োয়ারী—সাত্ত্বিক আহার করিত। মাড়োয়ারীর—মস্তকের চুল খসিয়া পড়িয়াছিল মুখগহ্বরের ঝিল্লী ফুলিয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠস্বর অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানদ্বয়ের অবস্থা এতদূর ভীষণ হয় নাই। চিকিৎসা প্রারম্ভে আমি তিনজনকেই জোলাপ দিই। তার পর চালমুগরার বিশুদ্ধ তৈল (anti-leprol) মাংসপেশীতে পিচকারীর সাহায্যে প্রয়োগ করি। ২, C. C. তৈল ৩ দিন অন্তর injection দিই। ৭ মাস পরে মাড়োয়ারীটি ভাল হইয়া গেল। কিন্তু ১ বৎসরেরও অধিক কাল মুসলমানদ্বয়কে চালমুগরার capsule (১৪০ ফোঁটা পর্য্যন্ত) খাওয়াইয়াও কোনও উপকার দেখাইতে পারিলাম না। আমার চিকিৎসাধীন হইয়াও মাড়োয়ারী—বৈদ্যের ঔষধ পরিত্যাগ করে না। সে প্রত্যহ—নিম ছালের গুঁড়া ঘৃতের সহিত সেবন করিত। নিমের বীজ ঘৃতে ভাজিয়া গায়ে মাখিত, নিমশাখার দাঁতন করিত। আমার বিশ্বাস—মাড়োয়ারী যে ভাল হইল —নিমের প্রভাবও তাহার একটী কারণ। নিরামিষ ভোজনও একটী কারণ।

আয়ুর্ব্বেদে কুষ্ঠরোগের অসংখ্য ঔষধ কল্পিত হইয়াছে। কত চূর্ণ, কত বটিকা, কত তৈল, ঘৃত, প্রলেপ !! এই সকল ঔষধের উপাদানের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

শিশুচিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন

কাস ও শ্বাসে।—(১) কণ্টকারী, বালতী, নতী ও নাগকেশর চূর্ণ সমভাগে ২।৩ রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুর কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়। (২) ধনের গুঁড়া ও চিনি—চাউল ধোয়া জল সহ পান করাইলে শিশুর কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়। (৩) দ্রাক্ষা (কিসমিস), বাসক, হরীতকী, পিঁপুলের গুঁড়া—মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করাইলে শিশুর শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। (৪) ছুরালতা, হরীতকী, পিঁপুল, কিসমিস—ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইলে শ্বাস, কাস ও হিক্কা নষ্ট হয়। মাত্রা প্রত্যেক দ্রব্য ১ বৎসরের শিশুর জন্য সিকি রতি। (৫) কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল ও ছুরালতা—ইহাদের চূর্ণ সিকি রতি মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুদিগের সর্ব্ববিধ কাস রোগ আরোগ্য হয়।

বমন রোগে।—(১) বৃহতী, কণ্টকারী ও বেগুন ফলের রস মধুর সহিত অল্প মাত্রায় লেহন করাইলে শিশুদিগের বমি বন্ধ হয়। (২) প্রিয়ঙ্গু, কুলের আঁটির শাঁস, মুথা ও রসাঞ্জন—একত্রে ১ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের বমন নিবারিত হয়। (৩) কট্‌কী চূর্ণ—মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের অতি প্রবল বমন ও হিক্কা নিবারিত হয়। (৪) গেরিমাটি চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইলে বমন ও হিক্কা পীড়িত বালক অতি সত্বর সুস্থতা লাভ করে।

রক্তাতিসারে।—(১) জামছালের রস—কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পান করিলে শিশুদিগের রক্তাতিসারের বিশেষ উপকার হয়। (২) কুড়চির ছাল চূর্ণ ১ রতি, গেরিমাটি অর্দ্ধ রতি—কিঞ্চিৎ চাউল ধোয়া জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে শিশুদিগের রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। (৩) কাঁচা বেল পোড়াইয়া তাহার শাঁস চারি আনা, ইক্ষুগুড় দুই আনা—জলের সহিত পাতলা করিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসারে উপকার দর্শে।

শোথে।—(১) যবক্ষার ১ রতি, মিছরি এক আনা, শ্বেত পুনর্ণবার রসের সহিত দুই তিন বার করিয়া সমস্ত দিনে সেবন করাইলে শিশুদিগের হাত পায়ের ফুলা বিনষ্ট হয়। (২) শ্বেত পুনর্ণবার রস ১ ঝিনুক—কিঞ্চিৎ মিছরির সহিত প্রত্যহ ২।৩ বার পান করাইলে বালকদিগের শোথ আরোগ্য হয়। (৩) পুনর্ণবা, নিমছাল, নতি, শুঁঠ, কট্‌কী, বিটলবণ, দেবদারু, হরীতকী—ইহাদের কাথ দুই ঝিনুক করিয়া কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করাইলে শিশুদিগের শোথ বিনষ্ট হয়। এই সকল দ্রব্যের মাত্রা প্রত্যেকটি দুই আনা। এই কাথ কিন্তু পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে দেওয়া নিষেধ।

সমালোচনা।

অব্যর্থ সিদ্ধ মুষ্টিযোগ।—কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা। মুষ্টিযোগের পুস্তক বাজারে অনেকগুলি বাহির হইয়াছে, এখানি তাহাদিগের অন্যতম। এই পুস্তকে গ্রন্থকারের কতকগুলি ব্যবহৃত দৃষ্ট-ফল মুষ্টিযোগের সহিত শাস্ত্রীয় মুষ্টিযোগগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কাজেই এ গ্রন্থে অনেক নূতন মুষ্টিযোগ শিখিতে পারা যাইবে। আগে মুষ্টিযোগ ও টোটকার ব্যবহার দেশে খুবই প্রচলিত ছিল, অনেক পাকা গৃহিণী পর্য্যন্ত সে সকল মুষ্টিযোগ ও টোটকায় অনেক কঠিন কঠিন রোগ আরাম করিতেন। এখন সে গৃহিণীও নাই, সে মুষ্টিযোগও নাই—এ অবস্থায় মুষ্টিযোগ ও টোটকার গ্রন্থ লইয় যিনিই আমাদের নিকট উপস্থিত হইবেন, তিনিই ধন্যবাদার্হ; তাহার উপর সেই সকল পুস্তকে যদি দৃষ্ট ফল ঔষধ থাকে, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থের গ্রন্থকারের নিকট তো দেশের লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য। আমরা এ গ্রন্থখানি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

সতুরমা। "দময়ন্তীর কথা" রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। মূল্য ১।০ "সতুরমা", "বিশ্বেশ্বর দর্শনে," "বন্ধু" "অলক্ষণা", "হালির ধুমকেতু" "মিলন" ও "বীণার বিবাহ"—এই কয়টি গল্প লইয়া "সতুরমা" বিরচিত। গল্পগুলি নভেলের ধরণে লিখিত হইলেও "মলয় পবন" "হা হতোহস্মি" বা বিকট বিরহে প্রেমিক-প্রেমিকার উৎকৃষ্ট চিত্তবিকৃতির ছায়া মাত্র ইহাতেনাই। সাদা কথায় সোজাভাবে বুরুচির লেশমাত্র যাহাতে স্পর্শ করিতে না পারে—এরূপভাবে সকল গল্পগুলিই লিখিত হইয়াছে। এখনকার দিনে যে সকল নভেল বাহির হইতেছে, তাহার অধিকাংশই পিতা-পুত্রে, ভ্রাতা-ভগ্নীতে, গুরুজন-অনুজনে একত্র বসিয়া পাঠ করিবার উপায় নাই, কিন্তু আমরা 'সতুরমা'র বিশেষত্ব দেখিলাম যে, ইহাতে সে আশঙ্কা একেবারেই নাই, গুরু লঘু বিচার না রাখিয়া ইহা সকলের নিকটেই পড়িয়া শুনান যায়। অথচ ইহার জন্য গল্পের সজ্জা-সম্পদের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমরা এই নভেলিযুগে এরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক পড়িয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী এই ধরণের আরও কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া যশোরাশি অর্জ্জন করুন—ইহাই আমাদিগের কামনা।

বিরজা-বিয়োগ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ সাধক কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয় আর এ সংসারে নাই। গত ২৬শে মাঘ রাত্রি সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার সময় তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সমস্ত মায়াজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া বাটী গিয়া আহার সমাপনান্তে নিদ্রাসুখ উপলব্ধি করিতেছিলেন, রাত্রি ১১টার পর নিদ্রাভঙ্গে বলিলেন,—বুকের মধ্যে কি একরূপ যন্ত্রণা হইতেছে,—ক্রমে সেই যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, একটু জল চাহিয়া পান করিলেন, জল পানান্তে আবার শয়ন করিলেন, সেই শয়নই তাঁহার চির শয়ন হইল, আর তিনি শয্যাত্যাগ করিলেন না, নিমেষের মধ্যে চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, স্থির শান্ত প্রকৃতির বক্ষে প্রলয়ঙ্কর ঝটিকার আবির্ভাব। আমরা যখন এই নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম, তখন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, তাহার পর গিয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই প্রগাঢ় পণ্ডিত বিরজাচরণ আমাদিগকে চির দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এরূপ মৃত্যু ইতঃপূর্ব্বে আমরা আর কখনও দেখি নাই, প্রতি দশ হাজারের মধ্যে ১ জনের করিয়া এরূপ মৃত্যু সংঘটন হয় কিনা তাহাও সন্দেহ।

আগামীবারে আমরা আয়ুর্ব্বেদের এই চির উপাসকের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলন।—আগামী ৩১শে মার্চ্চ ইন্দোরে নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্-এ, এল্, এম্, এস্, মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগ—ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট একটি সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন কল্পনা হইতেছে।

বাঙ্গালার পল্লীস্বাস্থ্য।—বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার পল্লী স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ৫০টি ম্যাজিক লণ্ঠনে স্বাস্থ্য বিষয়ক চিত্র প্রদর্শন করান হইতেছে। ইহাতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারের সুবিধা হইবে বিবেচনায় শীঘ্রই লণ্ঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। বেণ্টলি সাহেব ১৯১৮ খৃঃ অব্দের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপে বাঙ্গালার পল্লীগুলি শ্মশান হইতে বসিয়াছে এবং ম্যালেরিয়াই ইহাদিগের মধ্যে প্রধান। এই ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ-পরীক্ষা বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কোথাও আংশিক ভাবে, কোথাও

সম্পূর্ণভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য পরীক্ষার ফলাফল নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-কমিশনার মহাশয় বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ ফল শুভ হইবে বলিয়া অনেকটা আশা করা যাইতে পারে। পল্লীর কৃতীপুরুষগণ যদি এ সময় একটু চেষ্টাশীল হন, তাহা হইলে ইহার ফল আরও শুভ হইতে পারে।

জন্ম মৃত্যুর হিসাব।—১৯১৮ সালে বাঙ্গালার বর্দ্ধমান জেলায় মোট লোক জন্মিয়াছিল ২২৯২ জন এবং মরিয়াছিল ৫৬৯০ জন। বীরভূমে জন্ম ১৫৯২ ও মৃত্যু ৪৭১৯, বাঁকুড়ায় জন্ম ১৭১৫ ও মৃত্যু ২৫৯২; মেদিনীপুরে জন্ম ৫৪১৮, মৃত্যু ১৫৮৬৮, হুগলি ও শ্রীরামপুরে জন্ম ২১৯৬, মৃত্যু ৩৫৯০, হাওড়ায় জন্ম ১৭৯১, মৃত্যু ২১৭২, ২৪ পরগণায় জন্ম ৪৩১০, মৃত্যু ৬৭৩৭, নদীয়ায় জন্ম ৪৬৬৯, মৃত্যু ৫৭৩৭, মুর্শিদাবাদে জন্ম ৩৫১৮, মৃত্যু ৫৭৯৪, যশোহরে জন্ম ৩৬০৬, মৃত্যু ৫৪১৮, খুলনায় জন্ম ৪২৮২, মৃত্যু ৯৪১৫, দিনাজপুরে জন্ম ৪৪৮০ মৃত্যু ৭৮০৬, জলপাইগুড়িতে জন্ম ২৭০১, মৃত্যু ২৬৬৬, দার্জ্জিলিংয়ে জন্ম ৬৯১ মৃত্যু ৬৬৭, রংপুরে জন্ম ৮৩৭১, মৃত্যু ৬৩২২, বগুড়ায় জন্ম ৩০১৬, মৃত্যু ২৪০৭, পাবনায় জন্ম ৪২৫২, মৃত্যু ২৭৭৩, মালদহে জন্ম ৩১৯২, মৃত্যু ৪০৫৯, ঢাকায় জন্ম ১১২২৬, মৃত্যু ৭৪২০, ময়মনসিংহে জন্ম ১২৬৭২, মৃত্যু ৯১২৬, বাখরগঞ্জে জন্ম ৭২৯৭, মৃত্যু ৭৪১৪, ফরিদপুরে জন্ম ৮৫৩০, মৃত্যু ৫৭৬৬, চট্টগ্রামে জন্ম ৩১০৭, মৃত্যু ৪৪৫২, নোয়াখালিতে জন্ম ৪২৯৭, মৃত্যু ৩৩৯১ এবং ত্রিপুরায় জন্ম ৭৮৯২ মৃত্যু ৫৯০৩। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে মোট উপরোক্ত ২৬টি জেলায় জন্ম সংখ্যা ১২৫,০১০ ও মৃত্যু সংখ্যা ২,৫০,২৮০। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে বাঙ্গালার মৃত্যু সংখ্যা ১ লক্ষ ১২ হাজার হইয়াছে। ভরসার কথা।

ইনফ্লুয়েঞ্জার ইতিবৃত্ত।—১৯১৮ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে চীন ও জাপানে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রথম আক্রমণ হয়। চীন হইতে আমেরিকায় এবং সেখানে হইতে ইওরোপে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যুদ্ধ জাহাজসমূহে এবং সৈন্যদিগের মধ্যে ইহা প্রথম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ১৯১৮ খৃঃ অব্দের মে মাসে এই রোগ গ্লাসগো সহরে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পর এই দুরন্ত ব্যাধি ভারত আক্রমণে যেরূপ সাজসজ্জা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

বর্দ্ধমানে চিকিৎসা বিদ্যালয়।—গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। দেশে রোগ বাহুল্যের তুলনায় এখনও যে পরিমাণ চিকিৎসকের প্রয়োজন, তাহাতে এই নূতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় সে অভাব কতকটা পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু বর্দ্ধমানে নহে, বাঙ্গালার অন্যান্য সহরগুলিতেও যে এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তাহা নিশ্চিত।

পল্লী প্রসঙ্গ।—ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির প্রকোপে বাঙ্গালার পল্লীগুলি যে পরিমাণে বিপর্য্যস্ত, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক পল্লীতেই সে পরিমাণ

দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা নাই। পল্লীর সকল প্রকার উন্নতি সাধনই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য্য, কিন্তু অন্যান্য কার্য্য অপেক্ষা এই বিষয়ের উন্নতিকল্পে তাঁহাদিগকে অধিক মনোযোগী দেখিলে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। মেদিনীপুরের সহযোগী "নীহার" সংবাদ দিয়াছেন,—

"মাননীয় কমিশনার বাহাদুরের মন্তব্যে দেখা গেল যে এ জেলায় জেলাবোর্ডের অধীনে ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা খুব কম। যাহাতে এ জেলাবাসীর চিকিৎসার সুবিধা সুচারুরূপে হইতে পারে, তজ্জন্য কমিশনার বাহাদুর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডকে উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিয়াছেন। যে যে স্থলে গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনের প্রচলন হইবে, তথায় ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ডিস্পেন্সারী থাকিবে। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড কেবল একটা বিশেষ মঞ্জুরী টাকা ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে প্রদান করিবেন। কমিশনার বাহাদুরের এ মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে যে, অচিরে এই ম্যালেরিয়া-ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-ওলাউঠা-বসন্ত পীড়িত আমাদের জেলায় সর্ব্বত্র সুচিকিৎসার বিধান হইবে।"

মেদিনীপুরের মত সকল স্থানের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডই এইরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়ে বৃদ্ধির জন্য মনোযোগী হইলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

গাভী চালান।—আমেরিকা হইতে কয়েকজন ব্যবসায়ী ভারতে আসিয়া বহু সংখ্যক গাভী ক্রয় করিয়া স্বদেশে চালান দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে ৬০ হাজার গাভী এইরূপ ভাবে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গুজরাট অঞ্চল হইতে এই সকল গাভী চালান দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় সর্দ্দার সৈয়দ আলি এল এক্সস এ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষকে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন। যাহা হউক ভারতে নানাকারণে তো গাভীকুল নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে, সে গোচারণের মাঠ নাই, সে গাভী পালনের স্পৃহাও ভারতবাসীর নষ্ট হইয়াছে। দেশে দুগ্ধ ঘৃত ইহার ফলে দুর্ম্মূল্য—দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার উপর যদি এইরূপ ভাবে বিদেশে গাভী চালান বন্ধ না হয়, তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ যে আরো শোচনীয় হইবে সে—বিষয়ে সন্দেহ নাই, গুজরাটের শিক্ষিত অধিবাসীগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হউন।

আহারে উপদেশ।—আহারে বসিবার পূর্ব্বে মেজাজ খুসি রাখিবার চেষ্টা করিবেন,—নহিলে আপনার উচিতমত ক্ষুধার উদ্রেক হইবে না। ফলে ক্ষুধা না থাকিলেও আহার করিয়া বদ-হজমে ভুগিতে হইবে। আহারের সময়ে তর্ক-বিতর্ক করাও নিষিদ্ধ; কারণ তাহাতেও কুফলফলে। (হিন্দুস্থান)

নূতন রোগ।—১৯১৮ খৃঃ অব্দের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে বাঙ্গালাদেশে হুক-ওয়ার্ম বা সর্ব্বনেশে ক্রিমি নামক একটি নূতন রোগের প্রাদুর্ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা ৮০জন হিসাবে মোট প্রায় ৩ কোটী ৬০ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগে অল্প পরিমাণে আক্রান্ত হইলেই জীবনীশক্তির হ্রাস, রক্তাল্পতা ও জড়তা ইত্যাদি উপসর্গ জুটিয়া থাকে। এই রোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

কুষ্ঠাশ্রম।—৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা চলিতেছে। আমাদের মহামান্য বড়লাট মহিষী লেডী রোণাল্ডশে মহোদয়া ইহার জন্য সাধারণের নিকট চাঁদা প্রার্থনা করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—চৈত্র। | ৭ম সংখ্যা

অনুকরণে আমাদের স্বাস্থ্য।*

—:*:—

অনুকরণে বাঙ্গালী যেরূপ অভ্যস্ত এরূপ আর পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো জাতি নহে। অনুকরণে বাঙ্গালীর যেরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এমন সর্ব্বনাশও বুঝি পৃথিবীর মধ্যে কোনো দেশের কোনো জাতির কখনো হয় নাই। আজি যে দেশে সকল জিনিসই দুর্ম্মূল্য, বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ঋতু উপযোগী পরিচ্ছদে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র পায় না, পল্লীবাসী-বাঙ্গালীর চালে খড় জুটে না, পূর্ব্বেকার অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীর পতিত প্রাসাদ সংস্কারাভাবে আর মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না, এক কথায় অশন বসন, লোক লৌকিকতা —সকল বিষয়েই বাঙ্গালী বাহিরে যতটাই বড়াই করুক, ভিতরে যে ঐ সকল বিষয় রক্ষার জন্য বাঙ্গালীকে বিষম বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছে—ইহার প্রধান কারণই হইতেছে বাঙ্গালীর অনুকরণপ্রিয়তা। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, রূপ রস-গন্ধাদির বিচার শক্তি লাভের সহিত মরণ কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সাংসারিক সকল বিষয়েই এই অনুকরণ লইয়া জীবন যাপন করিতেছে। ফলে অনুকরণ-প্রিয়তায় বাঙ্গালী এখনকার দিনে অর্থের মুখ আগের অপেক্ষা বেশী দেখিতে পাইতেছে সত্য, কিন্তু আধুনিক সভ্যতা বা ভদ্রতা বজায় রাখিতে গিয়া সে অর্থে কুলাইতে পারিতেছে না। অনুকরণে বাঙ্গালীর অনিষ্ট সাধন ইহারই ফল সম্ভূত।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই অনুকরণ-প্রিয়তায় আমাদের কম অনিষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালী-শিশু যে আগের অপেক্ষা এখন মরিতেছে বেশী ইহা তো সর্ব্ববাদী সম্মত। বাঙ্গালীর পরমায়ু কমিয়া গিয়াছে,—অকাল বার্দ্ধক্য বাঙ্গালীকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে,—নানারূপ রোগ-পীড়নে বাঙ্গালীসমাজ মৃত্যুর

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ৯ম বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

ভীষণ মূর্ত্তিকে যখন তখন—অসময়ে—আযুষ্কাল পূর্ণ হইতে না হইতে আলিঙ্গন করিয়া বসিতেছে,—এসকল বিষয়ের মুখ্য কারণও আমরা বাঙ্গালীর অনুকরণপ্রিয়তা বলিয়া মনে করি।

বাঙ্গালী তো এরূপ ছিল না,—বাঙ্গালীর বল ছিল, বিক্রম ছিল, শৌর্য্য ছিল, বীর্য্য ছিল, শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল। বাঙ্গালী শিশুর মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই চিত্রগুপ্তের খতিয়ানে নাম লিখাইবার আবশ্যক হইত না। ভূরি ভোজনে বাঙ্গালী যশস্বী হইত, ভোজ-নিমন্ত্রণে আয়োজনকারী, ভোক্তাকে পর্য্যাপ্ত ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিত। ভাত-কাপড়ের জন্য প্রায় কোনো বাঙ্গালীকেই গোলামি করিতে হইত না, সকল বাঙ্গালীরই ক্ষেত্রে ধান্য হইত, সম্বৎসর খরচ করিয়াও সে ধান্য ফুরাইত না, কোনো কালে অজন্মার জন্য যদি দেশে দুর্ভিক্ষ হয়—এই আশঙ্কায় উদ্বৃত্ত ধান্য গোলাপূর্ণ হইয়া সঞ্চিত থাকিত। সকল বাঙ্গালীর বাগানেই পরিবার পরিপোষণের উপযোগী তরকারী উৎপন্ন হইত, সে তরকারি বাগানের মালিক নিজে ভোগ করিয়াও প্রতিবাসী পরিজন বর্গকে বিতরণ পূর্ব্বক আনন্দ উপভোগ করিত। পুকুরে মাছ যথেষ্ট হইত,—কোনো আত্মীয় কুটুম্ব অসময়ে অতিথি হইলেও ইহার ফলে পরিচর্য্যার ব্যাঘাত ঘটিত না। ঘরে ঘরে গাভী পালনের ব্যবস্থা ছিল, সে ব্যবস্থায় বাঙ্গালী পরিবারবর্গের সকলেই ভোজনের প্রারম্ভে অল্প বিস্তর ঘৃত এবং ভোজনের পরিসমাপ্তি কালে অন্ততঃ দু'চার হাতাও দুগ্ধান্নভোজনের অপূর্ব্ব সুখ উপলব্ধি করিত। ফলে শরীর রক্ষার উপযোগী অনায়াসলভ্য ঐ সকল আহার্য্য প্রাপ্তির জন্য সেকালের সকল বাঙ্গালীই স্বাস্থ্যসুখ অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইতেন,—কলির নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু লাভ সকলের অদৃষ্টে না ঘটিলেও আশী নব্বই পঁচানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ যে অধিকাংশ বাঙ্গালীরই অদৃষ্টে ঘটিত ইহা সুনিশ্চিত।

এখন বাঙ্গালীর পরমায়ু হইয়াছে ঊর্দ্ধ সংখ্যা পঞ্চাশ। ত্রিশ বৎসরের পরই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়—এবং চল্লিশ বৎসরের পরই সকল বিষয়ের কার্য্যকারী শক্তি কমিয়া আসিয়া বাঙ্গালীর আয়ুষ্কাল ফুরাইবার চিহ্ন সকল যেন প্রকাশ করিতে থাকে। বাঙ্গালী-শিশু যত জন্মগ্রহণ করে,তাহার হাজার করা ১৮৫টি জন্মের পরই কালগ্রাসে পতিত হয়। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার যথেষ্ট লোক ক্ষয় হয় সত্য, কিন্তু অন্যান্য রোগেও বাঙ্গালীর মৃত্যু কম হয় না। সহরে যক্ষ্মা রোগের প্রাবল্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং অজীর্ণের রোগী এখন শতকরা ৯৯টি বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। অধিকাংশ বাঙ্গালীরই শীর্ণ দেহ, শুষ্ক বদন, কোটরাগত চক্ষু বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-দৈন্যের যেন জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আগে বাঙ্গালী পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মত একটা আদর্শ জাতি বলিয়া যেমন পরিগণিত ছিল, এখন আর তাহা নাই, অনেকে এখনকার বাঙ্গালী জাতিকে ইঙ্গবঙ্গ বলিয়া যে পরিহাস করিয়া থাকেন,বাঙ্গালীর পক্ষে সেই অভিধানই উপযুক্ত বলা যাইতে পারে। রাজভাষা বা ইংরাজী ভাষা না শিখিলে এখনকার দিনে চলিবার উপায় নাই, সুতরাং বাঙ্গালী তাহা শিখুক, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু সেই ইংরাজী ভাষা শিখিতে গিয়া বাঙ্গালী যে

নিজস্বের পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছে—ইহাইতো হইতেছে বাঙ্গালীর অনিষ্টের মূল। ইংরাজ যে সময় আমাদের দেশে রাজা হইলেন, সে সময় জনকতক বাঙ্গালী যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিয়া মোটা মোটা মাহিয়ানার চাকরি পাইলেন বলিয়া বর্দ্ধমান বাঁকুড়ার কৃষিপ্রাণ বাঙ্গালী সে অনুকরণে আত্মহারা হইলেন কেন? দেশে জনকতক লোক ওকালতী পাস করিয়া অর্থ উপায়ের পথ সুলভ করিয়া তুলিলেন বলিয়া অনেক বাঙ্গালীকেই ওকালতী পাস না করিলে চলিল না কেন? কয়েকজন ডাক্তার হইলেন বলিয়া অনেক বাঙ্গালীর মস্তিষ্কই ডাক্তারি শিক্ষার জন্য বিচলিত হইয়া উঠিল কেন? উঠিল উঠিল—সকল বাঙ্গালীরই উপার্জ্জন ক্ষেত্র সহরের নির্ণীত হইয়া পল্লীর সহজ সুলভ উপার্জ্জনের ক্ষেত্র বিসর্জ্জন দিবার কুমতি ঘটাইল কেন? ইহাই তো হইল বাঙ্গালীর অনিষ্টের মূল, এবং সে মূল এখন এমনভাবে গাড়িয়া বসিয়াছে যে, বাঙ্গালী সমাজকে তাহা হইতে উৎপাটন করা সুদূর পরাহত হইয়া পড়িয়াছে। যাক,—এ সব প্রসঙ্গ অন্যদিন করা যাইবে, আজ যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি।

বাঙ্গালী ইংরাজী শিখিল, কিন্তু শুধু বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংরাজী শিখিল না, ইংরাজের সকল আদর্শ গুলিরই অনুকরণ করিতে বাঙ্গালী তন্ময় হইয়া পড়িল! ইংরাজ প্রভাতে উঠিয়া চা পান করেন, বাঙ্গালী প্রাতঃস্নান ভুলিল, সন্ধ্যা গায়ত্রী সব ভুলিল, শয্যা পরিত্যাগ করিতে না করিতেই চায়ের পেয়ালা তুলিয়া রসনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল,—কিন্তু এটুকু বুঝিল না ইংরাজ জাতির অস্থিমজ্জা শীতপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়া গঠিত, এজন্য সে শরীরে প্রাতঃকালে শ্লেষ্মা বৃদ্ধির সময় চা এর মত উষ্ণকর দ্রব্যের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, আমাদের উষ্ণ প্রধান দেশে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা তেমনি বিষবৎ অনিষ্টকারী। তাহার উপর ইংরাজ কখনও খালি পেটে চা পান করেন না, কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে অবস্থায় ব্যবস্থায় তাহা ভিন্ন অন্য কিছু জুটিবে কি করিয়া? ফলে বাঙ্গালী ইংরাজের চা পানের অনুকরণ করিল বটে—কিন্তু তাহাতেও ইংরাজের আদর্শ টুকু বজায় করিতে পারিল না, কাজেই খালি পেটে চা পানের অবশ্যম্ভাবী ফল যে যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি প্রাপ্তি বাঙ্গালীকে তাহা ভোগ করিতে হইল! বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে না তো ঘটিবে কাহার?

তাহার পর বাঙ্গালী ইংরাজী শিখিয়া—B,A, MA, পাশ করিয়া,—বিলাত ঘুরিয়া আসিয়া, উকীল হইল, ডাক্তার হইল বটে, কিন্তু সে রোজগারের ক্ষেত্র নির্ণীত হইল কলিকাতায় বা এমন সব সহরে—যে সব স্থানে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী পল্লীর সহজ সুলভ উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নহে। কতকটা এই কারণে—কতকটা বা ইংরাজী শিখিতে গিয়া বাঙ্গালীর চিত্ত বৃত্তির বিপর্য্যায় বশতঃ আমাদের শরীরের উপযোগী পুষ্টিকর আহারীয় হইতে বাঙ্গালী বঞ্চিত হইল। সহরে গাভীপালন দুরূহ ব্যাপার, বহুব্যয় সাধ্য, কাজেই সে মতি প্রবৃত্তি বাঙ্গালীকে ছাড়িয়া দিতে হইল, যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ কিনিয়া খাইবারও উপায় উপার্জ্জনের তুলনায় থাকিল না। ইংরাজ দুগ্ধ ঘৃত ও মৎস্য যথেষ্টরূপে আহার করুন আর না

করুন মাংস তাঁহাদের প্রাত্যহিক খাদ্য। পক্ষান্তরে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী ইংরাজের পক্ষে মাংস ভক্ষণ যেরূপ ফলদায়ক ? বাঙ্গালা দেশের লোকের পক্ষে তাহা নহে, তা' ছাড়া প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে মাংস ভোজনের শক্তিও বাঙ্গালীর পাকস্থলীতে নাই, আর প্রত্যহ মাংস কিনিয়া ভোজন করাও বাঙ্গালীর অবস্থায় কুলাইবার কথা নহে, বাঙ্গালী প্রত্যহ অর্দ্ধ পোয়া হিসাবে মৎস্যই ভক্ষণ করিতে পায় না, তা' মাংস তো দূরের কথা। ফলে ইঙ্গবঙ্গ বাঙ্গালী—ইংরেজের অনুকরণ সর্ব্ব বিষয়ে করিতে চেষ্টা করিলেও আহারকালে আর সে অনুকরণ বজায় রাখিতে পারিল না। এই জন্যই আদর্শ হারাইয়া বাঙ্গালী মরিতে বসিল।

আগেকার বাঙ্গালী অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিত। হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনের পর প্রাতঃস্নান করিত, ভগবানের নাম লইত, তাহার পর, আদা-ছোলাভিজা, মুড়ি নারিকেল, গুড়-চিনি—অবস্থাপন্ন হইলে দু'একটি উপাদেয় সন্দেশ যাহার যাহা জুটিত, —বাঙ্গালী তাহা জলযোগ করিত। তাহার পর শিশুরা প্রাতঃকালেই পাঠাভ্যাসে নিরত হইত, যুবা এবং প্রৌঢ়গণ যাহার যাহা কর্ম্ম থাকিত, প্রাতঃকালেই তাহা সম্পন্ন করিত। দ্বিপ্রহরে বাঙ্গালীর আহারকাল নির্দ্দিষ্ট ছিল, আহারান্তে শিশু-বৃদ্ধ যুবা-প্রৌঢ় সকলেই কিয়ৎকাল বিশ্রামসুখ উপভোগ করিত। বৈকালে মার্ত্তণ্ডময়ূখ হীনপ্রভ হইয়া আসিলে বাঙ্গালী শিশু আবার পাঠাভ্যাস করিত, কর্ম্মি-গণ আবার কর্ম্মে মনোনিবেশ করিত। সন্ধ্যার পর আর কাহারও কোনো চিন্তা থাকিত না, সকল পল্লীতেই এক একটি বৈঠক বা মজলিস বসিত, সে মজলিসে যথেষ্ট তামাক পুড়িত, তাম্রকুটের ধূমে বিভোর হইয়া কর্ম্মশ্রান্ত বাঙ্গালী গল্পগুজব, গানবাজানা, তাসপাশা —এই সব লইয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া দিত। রাত্রি এক প্রহরের পর বাঙ্গালী আবার আহার করিত, ভগবানের নাম লইয়া সুনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিত। ইংরাজী শিখিয়া অনুকরণ স্রোতে আমাদের সে সকল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রভাতে আদা ছোলা ভিজার পরিবর্ত্তে চা পান—বেলা ৯টার পূর্ব্বেই মাধ্যাহ্নিক আহারের পরিসমাপ্তি; বিশ্রামের সময় অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, সন্ধ্যার পর ক্লান্ত দেহে আফিস হইতে আসিয়া নানারূপ দুশ্চিন্তা এবং নিদ্রাকালে দুশ্চিন্তার স্বপ্নজালে নিদ্রার ব্যাঘাত—এইরূপে আমাদের এখন জীবন যাপন চলিতেছে। ইংরাজী শিখিয়া সভ্যতার খাতিরে পল্লীগ্রামে ফিরিয়া গিয়া আমরা আর কৃষিকর্ম্মে বা ব্যবসায় বিস্তারে মনঃসংযোগ করিতে পারিনা, লোকে তাহাতে চাষা বলিবে বা ব্যবসাদার বলিয়া ঘৃণা করিবে, কাজেই লোকলজ্জার খাতিরে আমরা চাকরি করিব,—গোলামি করিব— কাজেই সেই গোলামি বজায় রাখিবার জন্য আমাদের কর্ম্মকাল দ্বিপ্রহরে না করিলে উপায় নাই, আমাদের আর বিশ্রাম করিবার সময় কোথায় ?

ইংরাজ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করেন না— ইংরাজের কর্ম্মকাল দ্বিপ্রহরে নির্দ্দিষ্ট, ইহার কারণও তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ইংরাজের জন্মস্থান শীত প্রধান দেশে—ইংরাজের জন্ম ভূমি যে দিন সূর্য্যের মুখ দেখিতে পান সে দিন ধন্যমনা হইয়া থাকেন, কাজেই সে দেশের কর্ম্মকাল দ্বিপ্রহরকালেই উপযুক্ত।

আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সে সময় আমাদের পরিশ্রম করা সহিবে কেন? আমাদের স্বাস্থ্য দৈন্যের ইহাও একটা কারণ।

তাহার পর পোষাক পরিচ্ছদের কথা। ইংরাজের অনুকরণে আমরা এখন যে সকল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করি—এরূপ পোষাক পরিচ্ছদ আমাদের সেকালে ছিল না। সর্ব্বদা জামা জুতা আঁটিয়া—দেহ খানিকে আলোক রৌদ্র বায়ুর হাত হইতে অব্যাহত রাখিয়া—ভদ্রতা বজায় রাখিবার জন্য সে কালের বাঙ্গালীকে কখন চলিতে হইত না। শিশুর পক্ষেও ভূমিষ্টকালের পরই তাহার সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না, তাহাকে উৎকৃষ্ট খাঁটি সরিষার তৈল মাখাইয়া সূর্য্যকিরণে শয়ন করাইয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল, শিশুর শরীর তাহাতে দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ হইত। এখন ইংরাজী অনুকরণে সে প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই এখন আমাদের দেহ সর্ব্বপ্রকারে আবৃত করিয়া না রাখিলে আর ভদ্রতা রক্ষা চলে না। বয়স্থেরাও সেকালে যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন করিতেন, সভ্যতা বজায় রাখিতে গিয়া আমরা সে প্রথাও তুলিয়া দিয়াছি, সাবান তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ঘৃত দুগ্ধ-পান ঘুচিয়া গিয়াছে, তৈলমর্দ্দন প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে,—বাঙ্গালীর দেহ পুষ্টির আর তাহা হইলে রহিল কি? বাঙ্গালী মরিবেনা তো মরিবে কে?

এইবার ধুমপানের কথা। তাম্রকুট কবে আমাদের দেশে আগমন করিয়াছে তাহার সঠিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন—মুসলমান রাজত্বের অভ্যুদয়কালে ইহা আমাদের দেশে মুসলমানদিগের অনুকরণে প্রবেশলাভ করিয়াছে। যাউক অত বিচার করিবার এ ক্ষেত্রে আবশ্যকতা নাই? কিন্তু জলপূর্ণ গুড়গুড়ি বা হুঁকার সাহায্যে তাম্র কুটের ধূম গ্রহণে আমাদের তত অনিষ্ট হয় না —যতটা অনিষ্ট হয় সহজসুলভ সিগারেটের ধূমপানে। এ অনুকরণটা আমরা ইংরাজদিগের নিকট যে শিক্ষা করিয়াছি ইহা খাঁটি সত্যকথা। ইংরাজই আমাদেই দেশে এ নেশা আনিয়া দিয়াছেন। এখন বালক বৃদ্ধ যুবা—সকলেই এই সিগারেটের ধূমপানে উন্মত্ত। বাঙ্গালী প্রতিবর্ষে অসংখ্য পরিমিত অর্থ সিগারেটের ধূম পানে ব্যয় করিতেছে। তামাক সেবনে গল ক্ষত, যক্ষ্মা, হৃদপিণ্ডের নানারূপ পীড়া, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। সিগারেটে সে অনিষ্ট আরও বেশী সাধিত হয়। কিন্তু অনুকরণ স্রোতটা দেশে এমনই ভাবে প্রবেশলাভ করিয়াছে যে,—সহজ সুলভ সিগা-রেটের হাত হইতে আর বালকদিগকেও রক্ষা করিবার উপায় নাই। তাহার পর, প্রকাশ্য হোটেলে বসিয়া আহার করা—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রস্তুত কিনা বিচার না করিয়া—বাজার হইতে অখাদ্য-কুখাদ্য অমিত অহিত সকল প্রকার খাদ্য কিনিয়া খাওয়া—ছত্রিশ জাতির এবং সকল প্রকার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট পাত্রে চা সোডা সরবত পানে কৃত-কৃতার্থ হওয়া—এটাও আমাদের সভ্যযুগে অনুকরণে আনিয়া দিয়াছে। ফলে এই সকল অনুকরণে একদিকে আমাদের অর্থের অপব্যয় তো হইতেছেই—স্বাস্থ্যোন্নোতির বিঘ্নও যে ইহাতে যথেষ্ট ঘটিতেছে—তাহা কেহ ভাবিতেছেন কি?

বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যেও অনুকরণ স্রোতটা এখন পূর্ণভাবে প্রবাহিত। মা-লক্ষ্মীগণও সে

কালের রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী ভদ্রতা বজায় রাখিবার জন্য বাবু সাজিয়াছেন, তাঁহাদেরও 'বিবি' না সাজিলে উপায় কি? কাজেই সে 'ছড়া ঝাঁট' দেওয়া, বাসন মাজা, ঘর দ্বার পরিষ্কার করা—এ সকল তো মা-লক্ষ্মীগণ এখনকার দিনে পারিয়াই উঠেন না,—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি লইয়া রন্ধন কার্য্যেও তাঁহারা এখন অনভ্যস্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর হেঁসেলে ইহারই ফলে অনুকরণ বজায় রাখিতে গিয়া মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার 'বামুন' ঢুকিয়াছে, দাস দাসীতে গৃহস্থালীর কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতেছে, মন্ত্রত্যাগী আচার ভ্রষ্ট—পৈতাগলায় বামুনের দল রন্ধন করিতেছে,—আর আমাদের মহিলাগণ আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া দিবারাত্রি আলস্য এবং অকর্ম্মণ্যতার সহচারিণী হইয়া দিবসের মধ্যে তিনবার করিয়া 'হিষ্টিরিক ফিটে' অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন!

এখন এ সকলের উপায় কি? এ সকলের উপায়ের কথা বলিতে হইলে—মুক্তকণ্ঠে বলিতে হয়—দেশবাসি, আবার সাবেক পদ্ধতি অবলম্বন কর। ইংরাজী পড়—ইংরাজী না পড়িলে চলিবে না—তুমি যে কোনো কর্ম্মই কর—ইংরাজী তোমাকে শিখিতেই হইবে—ইংরাজী না শিখিলে তোমার আর কোনোদিকেই উপায় থাকিবে না—কিন্তু যতটা পার অনুকরণ প্রথাটা পরিহার করিয়া আত্মরক্ষার জন্য মনোযোগী হও। পল্লী ছাড়িয়াছ, কৃষিকর্ম্ম ভুলিয়াছ, ব্যবসায় কল্পনায় তোমার মতি নাই, চাকুরি করিয়া—গোলামি করিয়া—এতদিন উদরান্নের সংস্থান করিয়া আসিয়াছ, সুতরাং সহসা তাহা ছাড়িয়া দিয়া পল্লী ভিটায় সন্ধ্যা জ্বালিয়া আবার তুমি প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বনে আত্মকর্ম্ম পরিগ্রহ কর—এরূপ কথাও সহসা বলিলে চলিবেনা, তবে এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, নিজে যাহা হইয়াছ তাহা থাক্, নিজে যাহা করিতেছ, তাহা কর, কিন্তু বংশধর দিগকে আর সে শিক্ষায় অবসন্ন করিওনা। শিক্ষার জন্য সকলেই পুত্রকে স্কুলে দেন, কলেজে পড়ান,—পুত্র যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটী ডিগ্রি লইয়া বাহির হয়, তখন আহ্লাদে আটখানা হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই পুত্র কি করিয়া নিজে খাইবে—পরিবার পোষণ করিবে—সে কথাটা একবার চিন্তা করিয়া দেখেন কি? তাহা দেখেন না, পড়াইতে হয়, পড়াইয়া যান, পুত্রও পড়িতে হয়, পড়িয়া যায়! কিন্তু রাশি রাশি পুস্তক পাঠে দৃষ্টিশক্তির অবসন্নতার ফলে উপচক্ষু ধারণ করিয়া এবং এক একজন মূর্ত্তিমান ডিসপেপটিক হইয়া যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তখন চাকরি বা গোলামি করা ভিন্ন তাহার তো আর কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং শিক্ষাকালেও তাহার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, কর্ম্মকালেও সে খাটুনির মাত্রা আরও অধিক। সেইজন্য আমার বক্তব্য, আমরা যাহা করিতেছি, তাহা করিয়া যাই, কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে আর উৎসন্ন দিয়া কাজ নাই, শিক্ষা কালেই তাহাদিগকে একটা ব্যবসায়ের পন্থা দেখাইয়া দিয়া তাহারা যাহাতে অক্ষত স্বাস্থ্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হই। পল্লী মায়া বিসর্জ্জন দিলে চলিবে না,—দেশের যেরূপ অবস্থা আসিতেছে তাহাতে পল্লীর অঙ্কে স্থান লইবার আবার প্রয়োজন হইবে,—দেশের ভবিষ্যত আশা ভরসার স্থল আমাদের বংশধরদিগের কল্যাণের জন্য এই মহামূল্য কথাটা তাহাদের

মনে ধারণা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হউক পল্লীর কৃষি আবার জাগিয়া উঠুক,—পল্লীর ব্যবসায় আবার বিস্তৃত হউক—বাঙ্গালী সন্তান ইংরাজী পড়িলেও পল্লীজনোচিত শিক্ষাই তাহার আদর্শ হউক,—সেই অসভ্য জনোচিত শিক্ষাই তাহার অতুলনীয় গর্ব্বের স্থান হউক---সভ্যতার আদর্শ চা চুরুট সিগারেটের প্রচলন দেশ হইতে উঠিয়া যাউক,—বরফ সোডা লেমোনেডের পরিবর্ত্তে সেই অসভ্য যুগের ডাব মিছরির পানা চিনির সরবতে বাঙ্গালী ছেলের রুচি বৃদ্ধি হউক,—দারুণ ঘৃণাব্যঞ্জক ভাবে হোটেলের বহুদূরে বাঙ্গালী বালক আবার অবস্থিতি করুক—বাঙ্গালী জননী নাটক নবেল ছাড়িয়া স্বামীপুত্রকে স্বহস্তে পঞ্চ ব্যঞ্জন সমন্বিত অন্নবিতরণের জন্য ব্যগ্রস্বভাবা হউন,—এক কথায় অনুকরণটা আমরা পরিহার করি,—একটা আদর্শজাতি বলিয়া আমরা আগে যে গর্ব্ব করিতে পারিতাম—সেই গর্ব্ব আবার গরীয়ান হই—সেই প্রাতঃস্নান, সেই পূজাপদ্ধতি,—সেই খাদ্যাখাদ্যের বিচার বাঙ্গালী সমাজে আবার ফিরিয়া আসুক—ইহাই আমার বক্তব্য। ইহা ভিন্ন আজি আমার অন্য কিছু বলিবার নাই।

শারীর বিদ্যা।

অস্থি বর্ণনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:-*-:—

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী, এম-এ, এল, এম, এস)

মধ্য-শরীরের অস্থি।

পৃষ্ঠবংশ—পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড মধ্য-শরীরের অবলম্বন স্বরূপ। চারিটী শাখা এবং মস্তক পৃষ্ঠবংশ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। ইহা সরল নহে, ধনুর ন্যায় বক্রতাবিশিষ্ট। সেই বক্রতাও উপরে, মধ্যে ও নিম্নে বিভিন্ন প্রকার। (নবম চিত্র দেখ)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃষ্ঠবংশে ছাব্বিশ খানি অস্থি আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্নের দুইখানি ত্রিকাস্থি এবং অনুত্রিকাস্থি নামে অভিহিত। অপর চব্বিশখানি অস্থিকে কশেরুকা বলে। স্থানভেদে কশেরুকা সকল তিনভাগে বিভক্ত। সাতখানি গ্রীবাদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে গ্রীবাকশেরুকা বলে; বারখানি পৃষ্ঠদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে পৃষ্ঠ কশেরুকা এবং পাঁচখানি কটিদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে কটী-কশেরুকা বলা হয়।

কশেরুকাগুলি বলয়াস্থি অর্থাৎ মধ্যে বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট। গ্রীবা হইতে কশেরুকাগুলি নিম্নদিকে ক্রমশঃ স্থূলতর। উহারা উপরে ও নীচে পরস্পরের সহিত সন্ধিযুক্ত।

প্রত্যেক কশেরুকার একটী কশেরুপিণ্ড ও একটী কশেরুচক্র আছে, প্রত্যেক কশেরুচক্রের দুইদিকে দুইটি মূল আছে, উহারা কশেরুপিণ্ডে সংযুক্ত। প্রত্যেক কশেরুপিণ্ডের সাতটী প্রবর্দ্ধন (বর্দ্ধিত অংশ) আছে, যথা—উপরে দুইটী ও নীচে দুইটী সন্ধি প্রবর্দ্ধন, দুইটী বাহু ও একটী পৃষ্ঠকণ্টক। প্রত্যেক কশেরুচক্রমূলের উপরে ও নিম্নে এক একটী করিয়া ছিদ্রার্দ্ধ আছে। দুইখানি কশেরুকাস্থি মিলিত হইলে সংযোগস্থলে ছিদ্রটী পূর্ণ হয়। প্রত্যেক কশেরুকার দুইদিকের এইরূপ দুইটী ছিদ্রের ভিতর দিয়া সুষুম্না কাণ্ড হইতে স্থূল নাড়ীসকল নির্গত হইয়া যায়। সুষুম্নাকাণ্ড কশেরুকাগুলির অভ্যন্তরস্থ বৃহৎ ছিদ্র বা সুষুম্নাবিবর' মধ্যে থাকে।

নবম চিত্র—পৃষ্ঠ বংশ।*

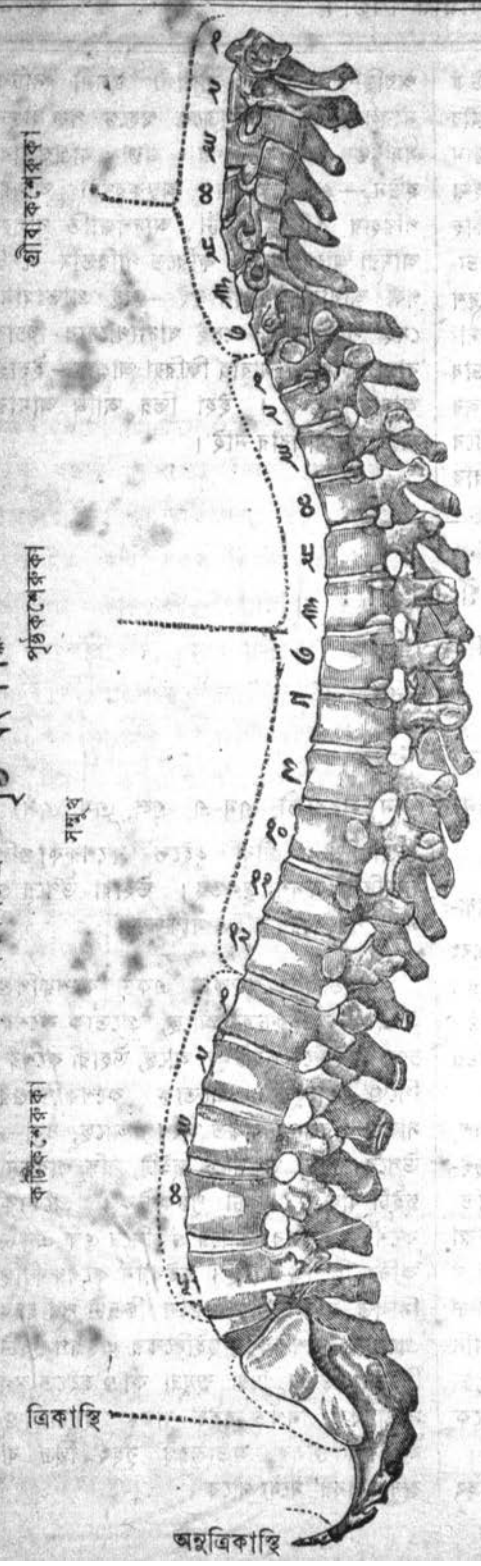

* ইং—Vertebral column —ভারটিব্রাল কলম বা Spine—স্পাইন্। কশেরুকা—Vertebra —ভারটিব্রা।

গ্রীবাকশেরুকা—প্রথমা গ্রীবা কশেরুকার নাম 'চূড়াবলয়া'। উহার ঊর্দ্ধভাগ মস্তকের পশ্চাৎ-কপালের সহিত এবং নিম্নভাগ দ্বিতীয় কশেরুকার সহিত সন্ধিযুক্ত।

[দশম চিত্র—প্রথমা গ্রীবাকশেরুকা—চূড়াবলয়া]

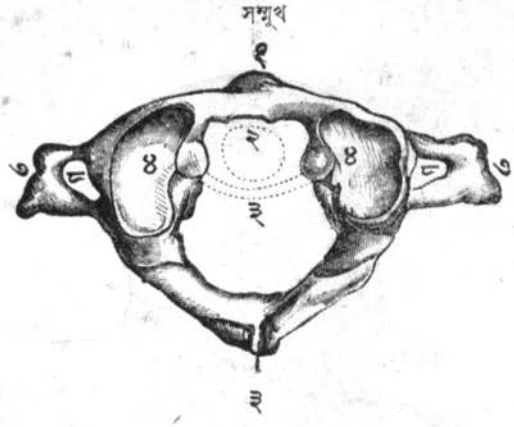

১—কশেরুপিণ্ড। ২—দন্তপ্রবর্দ্ধনকের নিবেশ ও তৎসহ সন্ধির স্থান। ৩—'মধ্যরজ্জু-কাখ্য' স্নায়ুর নিবেশ স্থল। ৪—পশ্চাৎ কপালের মূলকোটিদ্বয়ের সহিত সন্ধির স্থান। ৫—সুষুম্না-বিবর। ৬—পৃষ্ঠকণ্টক। ৭,৭—বাহুপ্রবর্দ্ধনকদ্বয়। ৮—মাতৃকাছিদ্রদ্বয়।

দ্বিতীয়া কশেরুকার নাম 'দন্তচূড়া'। ইহার চূড়াকার পিণ্ডভাগ প্রথম কশেরুকার সুষুম্না-বিবরের সম্মুখে যে ছিদ্র আছে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। যদি উদ্বন্ধন বা আঘাতাদি বশতঃ

[একাদশ চিত্র—দ্বিতীয়া গ্রীবাকশেরুকা-দন্তচূড়া]

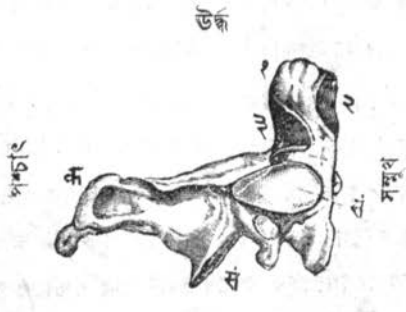

১—দন্তপ্রবর্দ্ধনক। ২—চূড়াবলয়ার পিণ্ডের পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সন্ধির স্থান। ৩—'মধ্যরজ্জুকা' স্নায়ু বিবর্ত্তনের খাত। ক—পৃষ্ঠকণ্ঠক। সং ১—ঊর্দ্ধতন সন্ধি-প্রবর্দ্ধন। সং২—অধস্তন সন্ধি প্রবর্দ্ধন।

দন্তচূড়ার দন্তাকার অংশ ভগ্ন বা চূড়াবলয়ার ছিদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে

তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। সপ্তমী গ্রীবাকশেরুকার নাম 'মহাকণ্টকিনী'। ইহার মহাকণ্টক অন্যান্য গ্রীবাকশেরুকার ন্যায় দ্বিধা ভিন্ন নত এবং এত কণ্টক 'গ্রীবাধরা' স্নায়ুরজ্জু সম্বদ্ধ থাকে। গ্রীবাকশেরুকাগুলির দুই পার্শ্বে 'মাতৃকা ছিদ্র' নামক ধমনী প্রবেশের ছিদ্র আছে।

[দ্বাদশ চিত্র—পৃষ্ঠ কশেরুকা]

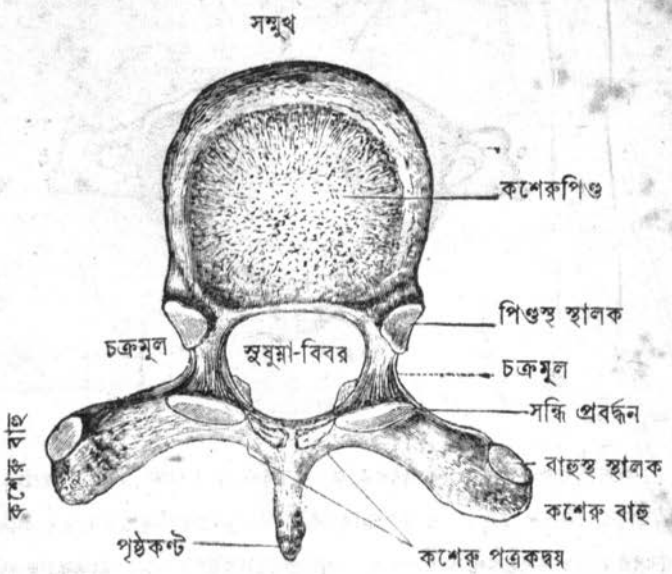

পৃষ্ঠ কশেরুকা—এই সকল কশেরুকার দুইদিকে পর্শুকা সংযোগের জন্য দুইটী করিয়া স্থালক যুক্ত বৃহৎ বাহু আছে। ইহাদের পৃষ্ঠকণ্টকগুলি দীর্ঘ ও বর্ত্তুলাকার।

কটি-কশেরুকা—এই কশেরুকাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পার্শ্বে আয়ত। ইহাদের বাহুপ্রবর্দ্ধনগুলি ছোট ও ত্রিমুখ। পৃষ্ঠকণ্টকগুলি ছোট, স্থূল এবং কুঠারাগ্র।

ত্রিকাস্থি*—ইহা দৃঢ়সংযুক্ত পাঁচখানি কশেরুকা দ্বারা নির্ম্মিত, প্রায় ত্রিকোণাকার এবং বৃহৎ ঝিনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট অস্থি। ইহার নির্ম্মাপক পাঁচখানি অস্থি বাল্যকালে পৃথক্ থাকে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এক হইয়া যায়। পাঁচখানি অস্থির সংযোগস্থলে চারিটী রেখাচিহ্ন থাকে এবং প্রত্যেক রেখাচিহ্নের সম্মুখে দুইটি এবং পশ্চাতে দুই দিকে দুইটী করিয়া মোট ষোলটী ছিদ্র থাকে। এই সকল ছিদ্র দিয়া স্থূল নাড়ীগুচ্ছ সকল ত্রিকাস্থির সম্মুখভাগে এবং পশ্চাদ্ ভাগে নির্গত হইয়া যায়, ত্রিকাস্থির উর্দ্ধভাগ পঞ্চমী কটি-কশেরুকার সহিত, উভয় পার্শ্ব শ্রোণিফলক নামক অস্থিদ্বয়ের সহিত এবং নিম্নভাগ অনুত্রিকাস্থির সহিত সংযুক্ত। ইহাদের অবয়বগুলির নাম চিত্রে দ্রষ্টব্য।

* ইং—Sacrum—সেক্রম।

[ত্রয়োদশ চিত্র—ত্রিকাস্থি]

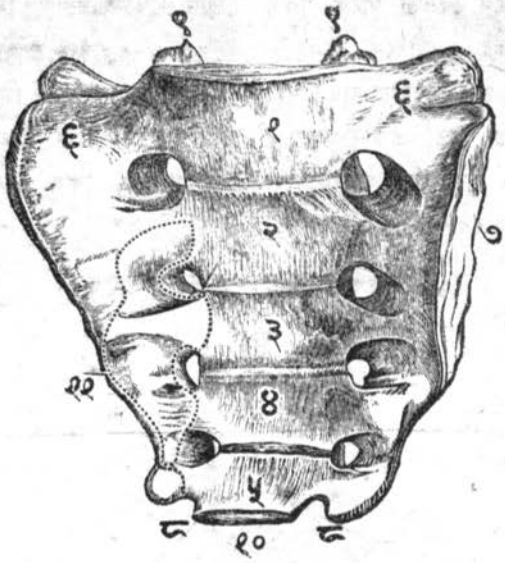

১, ২, ৩, ৪, ৫—ত্রিকাস্থি নির্ম্মাপক কশেরুকাগুলির সূচক। ৬, ৬—ত্রিকপক্ষদ্বয়। ৭,৭—শ্রোণিসন্ধির চিহ্ন। ৮,৮—অনুত্রিকাস্থির সহিত সন্ধির স্থান। ৯, ৯—ত্রিকশৃঙ্গাখ্য সন্ধি-প্রবর্দ্ধনক, পঞ্চম কটি-কশেরুকার সহিত সন্ধির স্থান। ১০—ত্রিকমুখ। ১১—শুণ্ডিকাখ্য পেশীর নিবেশ স্থান।

অনুত্রিকাস্থি*—এই ক্ষুদ্র অস্থি-সংঘাতটী ত্রিকাস্থির নিম্নে অবস্থিত এবং

[চতুর্দ্দশ চিত্র—অনুত্রিকাস্থি]

১,১—শৃঙ্গদ্বয়। ম—অনুত্রিকপিণ্ড। ২,২—স্নায়ুরজ্জু সংযোগের জন্য দুইটি প্রবর্দ্ধনক। ৩—অনুত্রিকাগ্র।

কতকটা শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্রাগ্র। ত্রিকাস্থির ন্যায় ইহাও চারখানি, কখন বা পাঁচখানি কশেরুকা অস্থির সংযোগে নির্ম্মিত হয়। ইহার ঊর্দ্ধভাগ ত্রিকাস্থির সহিত সংযুক্ত। ত্রিকাস্থির প্রথমা কশেরুকা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। অপর খণ্ডগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া অনুত্রিকাস্থির শেষ ভাগে লাঙ্গুলের ন্যায় হইয়াছে। ইহাই বহু ক্ষুদ্রকশেরুকাময় অস্থিমালা স্বরূপে গবাদি পশুর পুচ্ছাস্থি নির্ম্মাণ করে।

শ্রোণিফলক†—এই দুইখানি বৃহৎ

* ইং—Coccyx—কক্‌সিক্স।

† ইং—Os Innominate—অস্ ইনোমিনেট্।

কপালাস্থি মধ্যে ত্রিকাস্থির ও নিম্নে দুইটী উর্ব্বস্থির সহিত সংযুক্ত। বাল্যকালে প্রত্যেক শ্রোণিফলক তিনভাগে বিভক্ত থাকে, কিন্তু প্রৌঢ় যৌবনে পরস্পর মিলিত হইয়া একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। যৌবনে তিনখানি অস্থির সংযোগস্থল রেখাঙ্কিত থাকে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে ঐ রেখাগুলি মিলাইয়া যায়। দুইখানি শ্রোণিফলক পশ্চাতে ত্রিকাস্থিসহ এবং সম্মুখ ভাগে পরস্পর মিলিত হইয়া একটী গহ্বরের সৃষ্টি করে। উক্ত গহ্বর বস্তিগহ্বর নামে আখ্যাত। পুরুষের বস্তিগহ্বর গভীর এবং অল্প আয়ত, কিন্তু স্ত্রীলোকের বস্তিগহ্বর অগভীর এবং গর্ভধারণের জন্য বৃহৎ ও আয়ত।

[পঞ্চদশ চিত্র—শ্রোণিফলক]

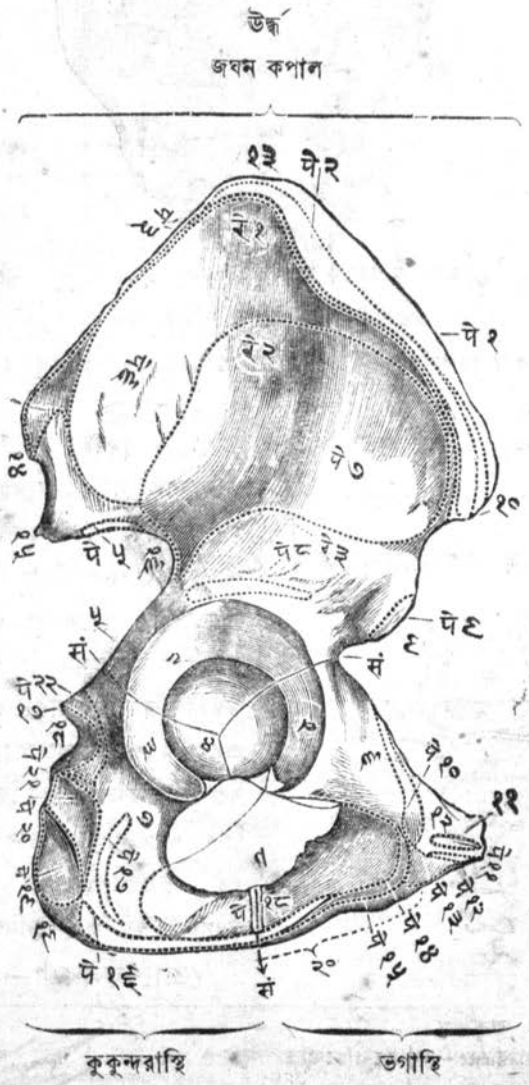

অধঃ

১, ২, ৩, ৪ বংক্ষণোদূখল। তন্মধ্যে ১—ভগস্থির অংশ, ২—জঘনকপালাংশ, ৩—কুকুন্দরাস্থির অংশ, ৪—তিনখানি অস্থির সংযোগকেন্দ্র। সং সং সং—তিনটি রেখা অস্থিত্রয়ের সন্ধানসূচক। ৫—জঘনকপালের সীমা। ৬—ভগাস্থির উত্তরশৃঙ্গ। ৭—কুকুন্দরাস্থি। ৮—শ্রোণিগবাক্ষ। ৯, ১০—জঘন কপালের অধস্তন ও ঊর্দ্ধতন অগ্রকূট। ১১, ১২—ভগাস্থি মুণ্ড বা ভগপীঠ। ১০ চিহ্ন হইতে ঊর্দ্ধ দিক দিয়া ১৫ পর্য্যন্ত অংশ—জঘনপক্ষ এবং উহার ধারা জঘনধারা। ১৩—জঘনচূড়া। ১৪, ১৫—জঘনকপালের ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পশ্চিমকূট। ১৬। গৃধ্রসীদ্বার। ১৭—কুকুন্দর কণ্টক। ১৮—কুকুন্দর দ্বার। ১৯—কুকুন্দর পিণ্ড। ২০—ভগাস্থির অধর শৃঙ্গ। 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী সমূহের নিবেশ স্থল। পেশী বর্ণনাধ্যায়ে বর্ণনীয়।

শ্রোণিফলকের প্রধান অংশ তিনটী— (১) জঘন কপাল, (২) কুকুন্দরাস্থি, (৩) ভগাস্থি। ইহাদের অবয়ব সমূহের বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

(১) **জঘনকপাল**—ইহা জঘনপক্ষ এবং বংক্ষণোদূখল—এই দুইভাগে বিভক্ত। পক্ষবৎ প্রশস্ত উপরিভাগকে 'জঘনপক্ষ' বলে। জঘন-পক্ষের দুইটী তল, বাহ্যতল এবং আভ্যন্তরতল। জঘন পক্ষের বাহ্যতলে বা জঘনপৃষ্ঠে 'নিতম্ব পিণ্ডিকা' নামে তিনটী পেশী সংযুক্ত থাকিয়া নিতম্ব (পাছা) নির্ম্মাণ করে। আভ্যন্তর তল বা জঘনোদর ঈষৎ খাতগর্ভ। ইহাতে 'কোষ্ঠ-ভূমিকা' পেশী সংসক্ত থাকে। জঘনকপালের উভয় তলের মধ্যবর্ত্তী উন্নত পরিধিকে 'জঘন-ধারা' বলে। উহার উচ্চতম প্রদেশ 'জঘন-চূড়া' নামে আখ্যাত। জঘনচূড়ার সম্মুখে দুইটী ও পশ্চাতে দুইটী উন্নত কূট আছে, উহারা যথাক্রমে ঊর্দ্ধতন অগ্রকূট ও অধস্তন অগ্রকূট এবং ঊর্দ্ধতন পশ্চিমকূট ও অধস্তন পশ্চিমকূট নামে অভিহিত হয়। জঘনোদরের অধোভাগে বস্তিগহ্বরের ঊর্দ্ধসীমাভূত 'বস্তি-কণ্ঠিকা' নামে স্থূল ও উন্নত রেখা আছে। ইহার পশ্চাতে কর্ণপালির ন্যায় আকার বিশিষ্ট 'ত্রিকস্থালক' নামক ত্রিকসন্ধিস্থান। ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে 'পৃষ্ঠবংশধারিণী' পেশীসকল সংবদ্ধ থাকে।

জঘনপক্ষের পশ্চাৎ দিকের তোরণাকার দ্বারকে 'গৃধ্রসীদ্বার' বলে। এই দ্বার দিয়া 'গৃধ্রসী' নাড়ী ও তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী এবং 'শুণ্ডিকা' পেশী নির্গত হয়।

জঘনকপালের বহির্দ্দিকে নিম্নভাগে 'বংক্ষণোদূখল' নামক যে উদূখলাকার গহ্বর আছে, তন্মধ্যে ঊর্ব্বস্থির মুণ্ড প্রবেশ করিয়া সংহিত হইয়া থাকে।

(২) **কুকুন্দরাস্থি**—ইহা শ্রোণি ফলকের অধস্তন অংশ এবং প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রাকার। বর্ণনাসৌকর্য্যার্থ ইহাকে বংক্ষণোদূখলাংশ, কুকুন্দরপিণ্ড এবং কুকুন্দরকূট—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

বংক্ষণোদূখলাংশ—বক্ষণোদূখলাংশের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার ত্রিকোণাকার নিম্নাংশ মাত্র কুকুন্দরাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার নিম্নে ও পশ্চাতে যে ত্রিকোণপ্রায় প্রবর্দ্ধনক

আছে তাহাকে 'কুকুন্দর কণ্টক' বলে। ইহার নিম্নভাগে যে ক্ষুদ্র তোরণাকার খাত আছে, তাহা 'কুকুন্দরদ্বার' নামে অভিহিত। এই কুকুন্দরদ্বারের ভিতর দিয়া 'অন্তঃস্থা শ্রোণিগবাক্ষিণী' পেশী এবং তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী ও নাড়ী সকল বস্তিগহ্বরে প্রবেশ করে।

কুকুন্দর পিণ্ড – ইহা শ্রোণিফলকের নিম্নতন অংশ। মনুষ্য উপবেশন করিলে এই অংশের উপর সমস্ত শরীরের ভার পড়ে।

কুকুন্দরকূট—ইহা কুকুন্দরপিণ্ডের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার সম্মুখবর্ত্তী শৃঙ্গ ভগাস্থির নিম্নমুখ শৃঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া শ্রোণিগবাক্ষের সম্মুখ সীমা নির্ম্মাণ করে।

(৩) ভগাস্থি – শ্রোণিফলকের সম্মুখবর্ত্তী অংশকে ভগাস্থি বলে। ইহা যোনি বা লিঙ্গের অধিষ্ঠানভূত। মুণ্ড, উত্তরশৃঙ্গ এবং অধরশৃঙ্গ ভেদে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। ভগাস্থির মধ্যস্থিত মুণ্ডবৎ অংশকে ভগমুণ্ড, ভগপীঠ বা লিঙ্গপীঠ বলে। ইহার অন্তঃসীমা অপর ভগাস্থির সহিত সংহিত হয়। ভগমুণ্ডের পশ্চাদ্‌ভাগের উন্নত অংশকে উত্তরশৃঙ্গ বলে। ইহা শ্রোণিগবাক্ষের ঊর্দ্ধ পরিধিভূত এবং উহার ঊর্দ্ধসীমা অভ্যন্তরস্থ 'বস্তিকণ্ঠিকা' রেখাঙ্কিত ও বস্তিগুহার ঊর্দ্ধ সীমাভূত। এই শৃঙ্গের শেষ প্রান্ত দ্বারা বংক্ষণোদুখলের ত্রিকোণাকার ঊর্দ্ধাংশ নির্ম্মিত হয়। অধরশৃঙ্গ ভগাস্থিমুণ্ডের নিম্ন দিয়া বহির্গত হইয়া কুকুন্দরকূটের সহিত সঙ্গত এবং শ্রোণিগবাক্ষের সম্মুখের পরিধিভূত। ইহার সম্মুখ ধারায় শিশ্নের মূলবন্ধন সংলগ্ন থাকে।

অংসফলক*—স্কন্ধপৃষ্ঠের দুইদিকে দুইখানি ত্রিকোণপ্রায় পক্ষবৎ বিস্তৃত যে কপালাস্থি আছে, উহাদের নাম অংসফলক। অংসফলকদ্বয় অংসসন্ধির পশ্চাদ্ভাগ হইতে নিম্নে সপ্তম পর্শুকার মূল পর্য্যন্ত তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত। উহাদের বহিঃসীমার ঊর্দ্ধ ও সম্মুখভাগ অক্ষক ও প্রগণ্ডাস্থিদ্বয়ের সহিত সংসক্ত এবং অন্তঃসীমা ও অন্যান্য প্রদেশ কেবল পেশী দ্বারা আবদ্ধ। চারিদিকে পেশী দ্বারা আবদ্ধ থাকায় অংসফলক সহজেই চারিদিকে বিবর্ত্তিত হইতে পারে।

* ইং—Scapula—স্ক্যাপুলা।

[ষোড়শ চিত্র—বাম অংসফলক]

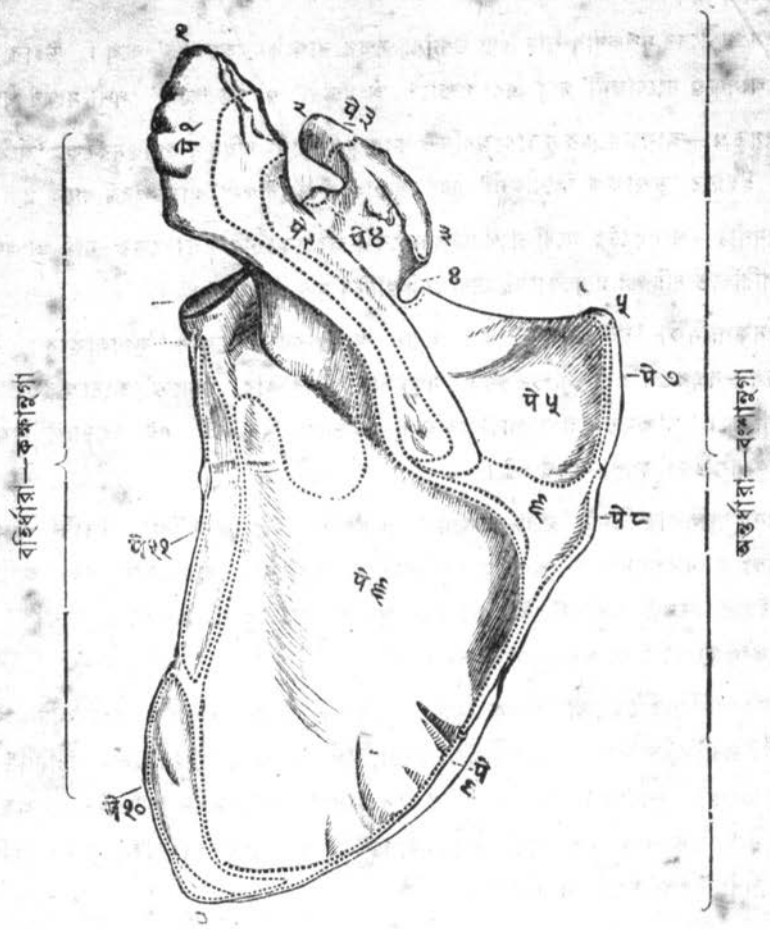

১ হইতে ৬—পর্য্যন্ত অংসপ্রাচীর। ১—অংসকূট ২—অংসতুণ্ড। ৩—অংসাক্ষকসংযোজনী ও তুণ্ডাংসক সংযোজনী স্নায়ুর নিবেশ স্থল। ৪—অংসশিরকোটর। ৫—অন্তঃকোটি। ৬—অংসপ্রাচীরের মূলদেশ। এই স্থানে 'পৃষ্ঠপ্রচ্ছদাখ্যা' পেশী শ্লেষ্মধরা কলার ব্যবধানে বিবর্ত্তিত হয়। ৮—বহিঃকোটিস্থ অংসপীঠ নামক স্থালক। 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল।

অক্ষকাস্থির সহিত সংহিত অংসফলক **অংসচক্র** নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইটী অংসচক্র পেশী ও স্নায়ু সংযুক্ত হইয়া অংসসন্ধির উপরে সন্ধিরক্ষক বর্ম্মের ন্যায় অবস্থিত।

এক একটী অংসফলক চারিভাগে বিভক্ত, যথা,—অংসপ্রাচীর, অংসতুণ্ড, অংসপীঠ এবং অংসকপালিকা।

অংসপ্রাচীর—ইহা অংসকপালের পশ্চাতে তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত এবং খড়্গের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। এই অংশ ত্বকের অধোভাগে স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়। ইহা দ্বারা

অংসপৃষ্ঠ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা,—'উত্তর' বা উপরের অংসপৃষ্ঠ এবং 'অধর' বা নিম্নের অংসপৃষ্ঠ।

অংসপ্রাচীরের সর্পফণার ন্যায় এবং উচ্চাবচ সম্মুখ ভাগকে 'অংসকূট' বলে। উহার অগ্রভাগে 'অংসতুণ্ড সংযোজনী' স্নায়ু এবং পশ্চাতে 'অংসচ্ছদা' ও 'পৃষ্ঠপ্রচ্ছদা' পেশী সংবদ্ধ থাকে।

অংসতুণ্ড—অংসফলকের চূড়ায় অবস্থিত কাকতুণ্ডাকার বহির্মুখ প্রবর্দ্ধনককে 'অংসতুণ্ড' বলে। ইহাতে 'তুণ্ডাক্ষক সংযোজনী' এবং 'তুণ্ডাংসক সংযোজনী' স্নায়ু সংবদ্ধ থাকে।

অংসপীঠ—অংসকূটের অধোভাগে অংসফলকের বহিঃকোটিস্থিত স্থালকের নাম 'অংসপীঠ'। ইহার পরিধিতে সন্নিবিষ্ট স্নায়ুকোষের মধ্যে প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড বিবর্ত্তিত হয়।

অংসকপালিকা—ইহা অংসফলকের প্রধান অংশ এবং ত্রিকোণ কপালাকার। ইহার দুইটী তল—সম্মুখতল এবং পশ্চিমতল। সম্মুখভাগ খর্পরাকার, ইহাতে 'অংসাস্তরিকা' পেশী সংলগ্ন থাকে। পশ্চিমতল অংস প্রাচীরেব দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। এই দুইভাগে উত্তরা ও অধরা 'অংসপৃষ্ঠিকা' পেশী সংলগ্ন হয়।

অংসকপালিকার তিনটী ধারা—ঊর্দ্ধধারা, অন্তর্ধারা এবং বহির্ধারা। ইহারা যথাক্রমে ঊর্দ্ধ, অন্তঃ ও বহিঃসীমারূপে অবস্থিত। তদ্ব্যতীত বহিঃকোণ, অন্তঃকোণ এবং অধঃকোণ নামে ইহার তিনটী সুব্যক্ত কোণ আছে। তন্মধ্যে বহিঃকোণ অংসপীঠে পরিণত। অন্য দুইটী কোণ ত্বকের নিম্নে অনুভব করা যায়।

অংসকপালিকার ঊর্দ্ধধারায় অংসতুণ্ডমূলে যে কোটর আছে, তাহাকে অংসকোটর বলে। এই কোটরের ভিতর দিয়া 'অংসারোহিণী' নাড়ী, সিরা ও ধমনী পৃষ্ঠের দিকে বিনির্গত হয়। বহির্ধারা কক্ষের (বগলের) সীমাভূত বলিয়া 'কক্ষানুগা ধারা' নামে অভিহিত। অন্তর্ধারা ধনুকের ন্যায় বক্রাকার এবং পৃষ্ঠবংশের সমীপস্থ বলিয়া 'বংশানুগা ধারা' বলিয়া কথিত। অন্যান্য পেশীনিবেশ পেশ্যধ্যায়ে বর্ণনীয়।

অক্ষকাস্থি*—অংসমূল হইতে উরঃফলকে সংসক্ত ধনুর ন্যায় ঈষদ্ বক্রাকার নলকাস্থির নাম অক্ষকাস্থি বা জত্রু। কণ্ঠের দুইদিকে দুইখানি অক্ষকাস্থি স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়। সাধারণে ইহারা 'কণ্ঠার হাড়' নামে পরিচিত। ইহাদের অন্তঃসীমা উরঃফলকের সহিত এবং বহিঃসীমা অংসফলকের অংসকূটের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

অন্যান্য নলকাস্থির ন্যায় অক্ষকাস্থিও দুইপ্রান্ত (অন্তঃপ্রান্ত ও বহিঃপ্রান্ত) এবং মধ্যনলক —এই তিন ভাগে বিভক্ত।

অন্তঃপ্রান্ত—অক্ষকাস্থির অন্তঃপ্রান্তে দুইটী সন্ধিচিহ্ন দেখা যায়। তন্মধ্যে উপরের চিহ্ন উরঃফলকের পার্শ্বদেশের সহিত এবং নিম্নের চিহ্ন প্রথমা উপপর্শুকার সহিত সন্ধির জন্য। ইহার নিম্নভাগে যে বন্ধুর স্থান আছে, উহা 'পর্শুকাক্ষকসংযোজনী' স্নায়ুর নিবেশ স্থল।

* ইং—Clavicle—ক্লাভিক্যাল্।

[সপ্তদশ চিত্র—বাম অক্ষকাদি]

(সম্মুখ হইতে দৃষ্ট)

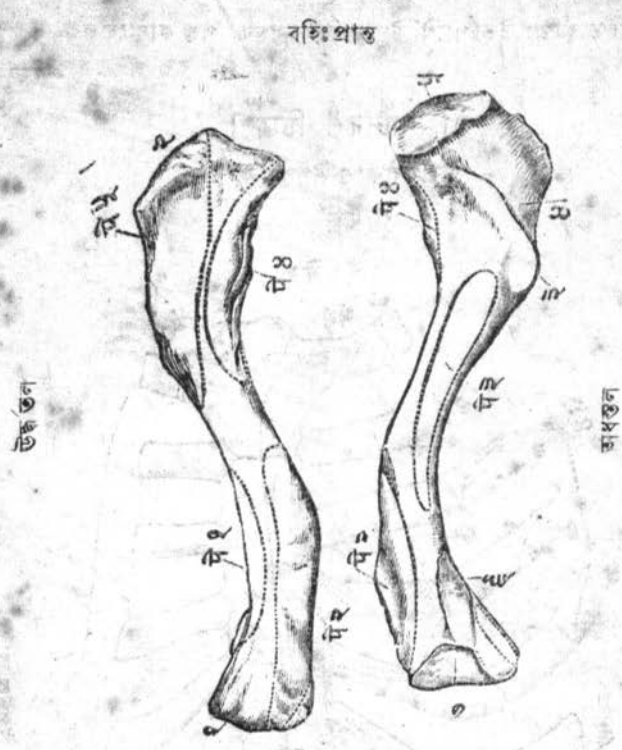

চিত্রদ্বয়ের বামটী উর্দ্ধতলের ও দক্ষিণটী অধস্তলের দৃশ্য। ১—অন্তঃপ্রান্ত (উরঃফলাভিমুখ)। ২—বহিঃপ্রান্ত (অংসাভিমুখ)। ৩—'ত্রিকোণিকাখ্য' স্নায়ু সংযোগের জন্য অর্ব্বুদ। ৪—'চতুরস্রিকা' স্নায়ু সংযোগের জন্য তিরশ্চীনা রেখা। ৫—অংসকূটের সহিত সন্ধির স্থান। ৬—'পর্শুকাক্ষকসংযোজনী' স্নায়ু সংযোগের জন্য বন্ধুর স্থান। ৭—প্রথম পর্শুকার উপরিভাগের সহিত সন্ধির চিহ্ন। 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল।

বহিঃপ্রান্ত—অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্ত অংসকূটের সহিত 'অংসাক্ষক সংযোজনী' স্নায়ুর দ্বারা প্রতিবদ্ধ।

মধ্যনলক—ইহা দুই স্থানে ধনুর ন্যায় বক্রাকার, বহিরর্দ্ধে উত্তান এবং অন্তরর্দ্ধে কুব্জ। অন্তরর্দ্ধের পরিধি দণ্ডবৎ গোল, কিন্তু বহিরর্দ্ধ চ্যাপ্টা। বহিরর্দ্ধের অধোভাগে যে অর্ব্বুদবৎ উৎসেধ আছে তাহাতে 'ত্রিকোণিক স্নায়ু এবং উক্ত অর্ব্বুদ হইতে উদ্গত তির্য্যক্‌রেখায় 'চতুরস্রিকা" স্নায়ু সংবদ্ধ থাকে। পেশীনিবেশগুলি যথাস্থানে বর্ণনীয়।

উরঃফলক*—এই ফলকাকার অস্থি বক্ষঃস্থলের মধ্যে অবস্থিত। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত—শিখরস্থ প্রথম খণ্ড 'গৈবেয়ক' নামে, মধ্যস্থ দ্বিতীয় খণ্ড 'মধ্যফলক' নামে এবং অধঃস্থ তৃতীয় খণ্ড 'অগ্রপত্র' নামে অভিহিত। তৃতীয় খণ্ড প্রথম বয়সে তরুণাস্থিময় থাকে। এই তিনখণ্ডে সংহিত অস্থির উভয়পার্শ্বে উপপর্শুকা নামক পর্শুকাসংযোজক তরুণাস্থি সকল সম্বদ্ধ থাকে।

[অষ্টাদশ চিত্র]

উরঃফলক ও উপপর্শুকা

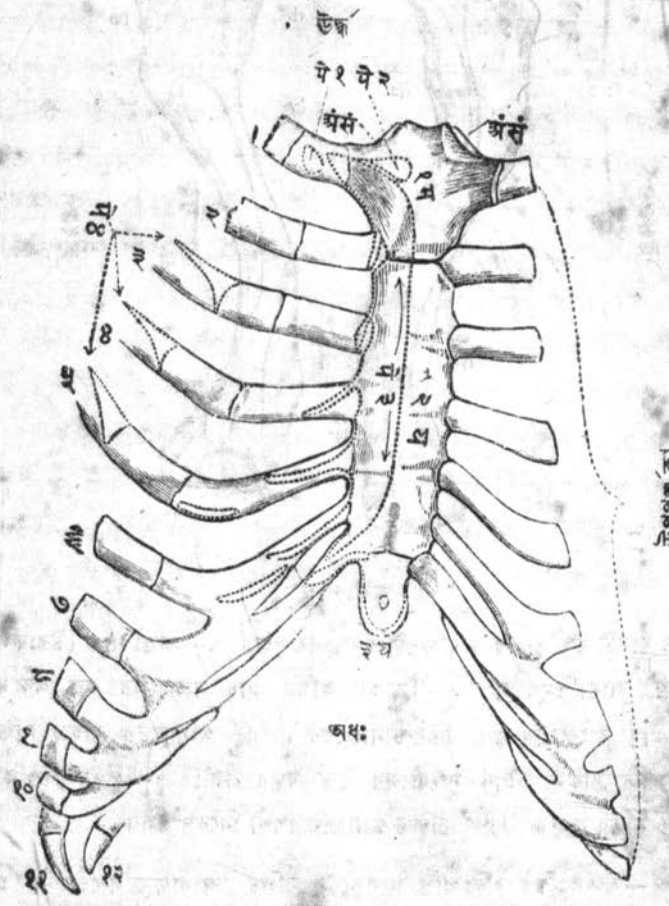

১ম, ২য়, ৩য়—উরঃফলক। তন্মধ্যে ১ম গ্রৈবেয়ক নামক প্রথম খণ্ড। ২য় মধ্যফলক নামে দ্বিতীয় খণ্ড। ৩য় অগ্রপত্র নামে তৃতীয় খণ্ড। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২,—উপপর্শুকা সহিত পর্শুকাগ্র। দক্ষিণ দিকে কেবল উপপর্শুকা পৃথক দেখান

* ইং—Sternum—ষ্টার্নম্।

হইয়াছে। অং, সং,—অক্ষক সন্ধি চিহ্ন। ক—কণ্ঠকূপ। 'পে' চিহ্নিত স্থান গুলি পেশীনিবেশ স্থল। যথাস্থানে বর্ণনী

গ্রৈবেয়ক—ইহা কণ্ঠমূলে অবস্থিত উরঃফলকের ষট্‌কোণ প্রথম খণ্ড। ইহাতে ছয়টী স্থালক আছে; তন্মধ্যে দুইটি স্থালক অক্ষকাস্থিদ্বয়ের সহিত, দুইটী প্রথমা উপপর্শুকাদ্বয়ের সহিত এবং অপর দুইটি দ্বিতীয়া উপপর্শুকাদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার শীর্ষ-দেশে যে খাত আছে তাহা 'কণ্ঠকূপ' নামে খ্যাত। ইহার নিম্নভাগ দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত সন্ধিযুক্ত, উভয়খণ্ড মিলিত হইয়া প্রায় একই অস্থিতে পরিণত হয়।

মধ্যফলক—উপরিভাগে প্রথম খণ্ডের সহিত এবং অধোভাগে তৃতীয় খণ্ডের সহিত সংসক্ত। ইহা চারিখণ্ড অস্থির সংঘাত দ্বারা নির্ম্মিত, ঐ চারিখণ্ড অস্থি বাল্যকালে পৃথক থাকে। ইহার এক এক পার্শ্বে উপপর্শুকা সংযোগের জন্য ছয়টি করিয়া স্থালক আছে।

অগ্রপত্র—উরঃফলকের ক্ষুদ্রতম নিম্নস্থ খণ্ড। ইহা তরুণাস্থিবহুল, কিন্তু বার্দ্ধক্যে সম্পূর্ণ কঠিন হইয়া যায়। যকৃতের বৃদ্ধি বশতঃ ইহার অগ্রভাগ উন্নত হইলে লোকে 'অগ্রমাংস' হইয়াছে বলিয়া থাকে। ইহার ঊর্দ্ধপ্রান্ত মধ্যফলকের সহিত সংবদ্ধ এবং ইহার সম্মুখ ভাগে 'উরঃপ্রচ্ছদা' পেশীর মধ্যকণ্ডরা ও পশ্চাতে উদরাভ্যন্তরস্থ 'মহা প্রাচীর' পেশীর অগ্রভাগ সংযুক্ত হইয়া থাকে।

পর্শুকা *—উরঃপঞ্জরের বেষ্টনভূত পর্শুকাগুলি ধনুর ন্যায় বক্রাকার এবং স্থিতিস্থাপক ভাবে আবদ্ধ। এক পার্শ্বে বারখানি করিয়া দুই পার্শ্বে চব্বিশখানি 'পর্শুকা' বা 'পার্শ্বক' (পাঁজরা) আছে। ইহাদের পশ্চাদ্‌ভাগ পৃষ্ঠকশেরুকাগুলির পিণ্ডের সহিত এবং প্রথম দশ-খানির সম্মুখভাগ উপপর্শুকা নামক তরুণাস্থি সমূহের সহিত সংবদ্ধ। বারখানি পর্শুকার মধ্যে প্রথম সাতখানি উপর হইতে নিম্নদিকে ক্রমশঃ দীর্ঘতর এবং এই সাতখানির দ্বারা প্রধানতঃ উরঃপঞ্জর নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'মুখ্যপর্শুকা' বলে। এই সাতখানি পর্শুকা স্ব স্ব অগ্রভাগস্থিত উপপর্শুকার সাহায্যে উরঃফলকাস্থির সহিত সম্বদ্ধ। অধঃস্থিত অপর পাঁচখানি পর্শুকা ক্রমশঃ হ্রস্বতর এবং উরঃফলকের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংবদ্ধ নহে। এইজন্য ইহারা 'গৌণ পর্শুকা' নামে অভিহিত। অষ্টমী, নবমী ও দশমী পর্শুকা স্ব স্ব অগ্র-ভাগস্থিত উপপর্শুকা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী পর্শুকার সহিত সংবদ্ধ। একাদশী ও দ্বাদশী পর্শুকার অগ্রভাগ বিমুক্ত অর্থাৎ কাহারও সহিত সংযুক্ত নহে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক পর্শুকার ছয়টী অঙ্গ আছে। যথা, মুণ্ড, অর্ব্বুদ, গ্রীবা, কোণ, কাণ্ড, এবং অগ্রকোটি।

মুণ্ড—পর্শুকার পশ্চাৎ প্রান্তকে মুণ্ড বলে। মুণ্ডে দুইটী গোলাকার স্থালক আছে এবং ঐ দুইটী স্থালক সাধারণতঃ দুইটী পৃষ্ঠকশেরুকাপিণ্ডের উপরের ও নীচের অর্দ্ধ স্থালকের সহিত সংবদ্ধ হইয়া থাকে।

* ইং—Ribs রিবস্।

অর্ব্বুদ—মুণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থালকাঙ্কিত পিণ্ডের নাম অর্ব্বুদ। কশেরুকার বাহুস্থিত স্থালকের সহিত অর্ব্বুদের সন্ধি হইয়া থাকে।

গ্রীবা—মুণ্ড এবং অর্ব্বুদের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম গ্রীবা।

কোণ—গ্রীবার সম্মুখস্থ কোণাকার অংশের নাম কোণ। এই স্থানের আকৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন ভগ্ন স্থান জোড়া দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ বাল্যকালে অস্থিখণ্ডগুলি পৃথক্ থাকে, এই স্থানেই যৌবনে জুড়িয়া যায়।

কাণ্ড—পর্শুকার ধনুর ন্যায় বক্রাকার মধ্যভাগকে কাণ্ড বলে। ইহার দুইটী ধারা আছে—অধোধারা এবং ঊর্দ্ধধারা। অধোধারায় একটী পরিখা বা খাঁজ আছে এবং সেই পরিখায় 'পর্শুকানুগা' সিরা, ধমনী ও নাড়ী অবস্থিতি করে।

অগ্রকোটি—পর্শুকার সম্মুখপ্রান্তের নাম অগ্রকোটি। এই স্থান ঊচ্চাবচ এবং উপপর্শুকার সহিত সন্ধিযুক্ত।

[ঊনবিংশ চিত্র—বিশিষ্ট পর্শুকা]

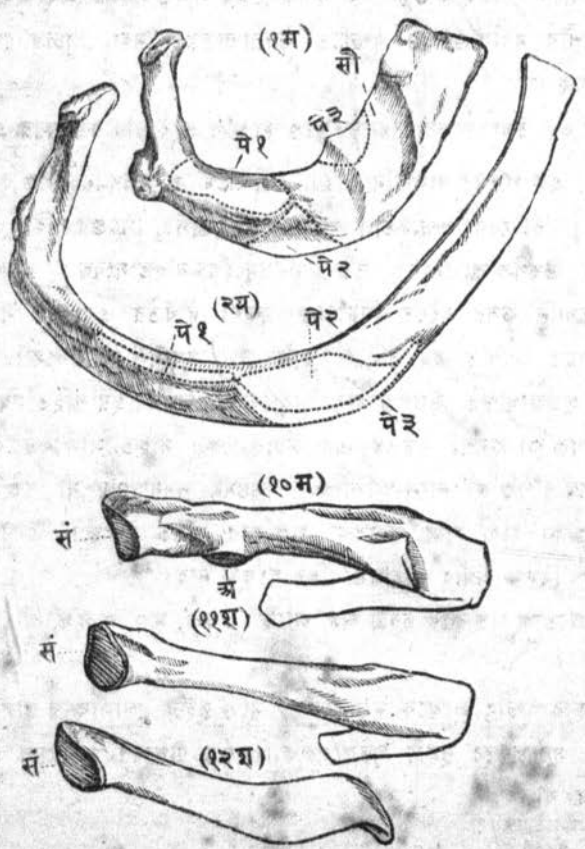

১ম—প্রথমা পশু'কা। ২য়—দ্বিতীয়া। ১০ম দশমী। ১১শ—একাদশী। ১২শ—দ্বাদশী। অ—অর্ব্বুদ। ক—কোণ। সং—মুণ্ডস্থ স্থালক। প্রথমা পশু'কায় ১,২—'অক্ষকাধরিকা' সিরা ও ধমনী ধারণের খাত। পে—চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল। (পেশ্যধ্যায়ে বর্ণনীয়)

তৃতীয় হইতে নবমী পশু'কার আকৃতি বর্ণিত হইল। প্রথমা, দ্বিতীয়া, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী পশু'কার যে বিশিষ্ট লক্ষণ আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে—

প্রথমা পশু'কা—ইহা হ্রস্বতম এবং কাস্তের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ইহার মুণ্ড ও স্থালক ক্ষুদ্রতম এবং কোণ বিশিষ্ট। কাণ্ড আয়ত, কাণ্ডের ঊর্দ্ধতলে 'অক্ষকাধরিকা' সিরা ও ধমনী ধারণের জন্য দুইটি খাঁজ আছে এবং নিম্নতলে বহু পেশী সন্নিবিষ্ট।

দ্বিতীয়া পশু'কা—ইহা প্রথমা পশু'কা অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং ইহার ঊর্দ্ধতলে দুইটী পেশী সন্নিবিষ্ট।

দশমী পশু'কা—ইহা হ্রস্ব এবং কতকটা বড়িশের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ইহার মুণ্ডে একটী স্থালক আছে এবং কোণটী কাণ্ডের মধ্যগত।

একাদশী পশু'কা—ইহাতে অর্ব্বুদ নাই, কোণ আছে।

দ্বাদশী পশু'কা—একাদশী পশু'কার ন্যায়। অধিকন্তু ইহাতে কোণও নাই।

উপপশু'কা*—ইহাদের সংখ্যা পশু'কার ন্যায় এবং ইহারা এক প্রান্তে পশু'কা ও অপর প্রান্তে উরঃফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত। প্রাচ্যমতে উপপশু'কাগুলি তরুণাস্থি বলিয়া অস্থিসংখ্যায় গণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাতীচ্য মতে ইহাদের অস্থি বলিয়া গণনা করা হয় না।

উরঃপঞ্জর।*

আমরা পূর্ব্বে যে উরোগুহার কথা বলিয়াছি তাহা উরঃপঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত। উরঃপঞ্জরের পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠবংশ, দুই পার্শ্বে পশু'কাগুলি এবং সম্মুখে উপপশু'কা ও উরঃফলক অবস্থিত। ইহা উপর হইতে নিম্নদিকে ক্রমশঃ আয়ত এবং নিম্নদিকে 'মহাপ্রাচীর' পেশী দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রধানতঃ শ্বাসনলীর সহিত দুইটী ফুস্‌ফুস্, অন্ননলী এবং স্থূল মহাসিরাদ্বয় ও মহাধমনী প্রভৃতি সংযুক্ত হৃদয় উরঃপঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত।

(ক্রমশঃ)

---

* ইং—False Ribs—ফল্‌স রিব্‌স্।
* ইং—Thorax—থ্যোরাক্স

শিশু পালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি, এ, সরস্বতী।

শিশুর পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক। বিশুদ্ধ বায়ু। শিশু যে ঘরে সর্ব্বদা থাকে সে ঘরের জানালা-দরজা দিবাভাগে সব সময়েই উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে। রাত্রিতেও শিশুর গায়ে বাতাস না লাগে অথচ ঘরে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু আসে—এরূপ ভাবে জানালা কিংবা দরজা খুলিয়া রাখিবে। জানালা কিংবা দরজা কিছু খুলিয়া ও কিছু বন্ধ করিয়া রাখিবে না। সেই অল্প ফাঁক দিয়া বাতাস জোরে ঘরের ভিতর ঢুকিলে তাহা শিশুর গায়ে লাগিলে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। বিশুদ্ধ বায়ুই জীবন, শিশু যেন সর্ব্বদা ইহার মধ্যে থাকে।

রৌদ্র। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরে সর্ব্বাপেক্ষ বেশী রৌদ্র আসে, সেই ঘরে শিশুকে রাখিবে। কোন রোগের বীজাণু রৌদ্রে বাঁচিতে পারে না, রৌদ্র সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট করে।

উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার। শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য মাতৃদুগ্ধ। তাহার অভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক গাধার, গাভীর কিংবা ছাগ দুগ্ধ অথবা অন্য কোন কৃত্রিম দুধ দেওয়া উচিত। বয়োবৃদ্ধির সহিত দেহ গঠনোপযোগী উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য শিশুকে দিবে।

নিয়ম মত আহার। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া শিশুকে আহার করাইবে। দুইবার আহারের মধ্যে অন্য কিছুই শিশুকে কখনো খাইতে দিবে না। প্রতিদিন ঠিক নিয়ম মত সময়ে যাহাতে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তাহা দেখিবে। প্রতিদিন যথা সময়ে শিশু যাহাতে নিদ্রা যায় এরূপ অভ্যাস করাইবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত যাহাতে নিদ্রা হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। শিশুর আহার, নিদ্রা, কোষ্ঠপরিষ্কার নিয়মবদ্ধ করিতে পারিলে শিশু এবং তাহার মাতা উভয়েই আনন্দে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।

স্নান। শিশুর স্নান অতি সত্বরতার সহিত সম্পাদন করিবে। স্নানের পূর্ব্বে গরম জল, বস্ত্রাদি সমস্তই গুছাইয়া তবে স্নান আরম্ভ করিবে।

উপযুক্ত বস্ত্র। শিশুর বস্ত্রাদি হাল্‌কা ঢিলা, আরামদায়ক, সচ্ছিদ্র এবং যাহা সহজে খোলা এবং পরান যায় এরূপ হইবে।

পরিচ্ছন্নতা। শিশুর সম্পর্কিত সমুদয় দ্রব্যই যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, শয্যা, খাট, আহার্য্য দ্রব্যের বাসন পত্র, বোতল প্রভৃতি যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখিবে। শিশু এত দুর্ব্বল যে কোন রোগের বীজাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি তাহার দেহে নাই। সুতরাং মাতা দেখিবেন যে, কোন প্রকার অপরিচ্ছন্নতা যেন শিশুর নিকটে না আসে, কারণ অপরিচ্ছন্নতার মধ্যেই রোগের বীজাণু থাকে।

ফুটন্ত জল (Boiled Water)। যে সব স্থানের জল বিশুদ্ধ নহে, তথাকার জল

ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে খাইতে দিবে। স্নানের জলও ফুটান উচিত।

নিদ্রা। শিশুকে মাতার সহিত এক শয্যায় কখনো শোয়াইবে না। তাহাকে প্রথম হইতেই পৃথক শয্যায় শুইতে অভ্যাস করাইবে। কেবল আহারের সময় শিশুকে জাগাইবে।

শিশুর বাসগৃহ। (Nursery).

বাড়ীর মধ্যে যে ঘরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রৌদ্র আসে এবং বায়ু চলাচল করে সেই ঘরে শিশুকে রাখিবে। শিশুর জন্য একটি পৃথক ঘর রাখিবার সুবিধা না হইলে বাড়ীর যে ঘরে বেশী রৌদ্র ও বায়ু আসে সেই ঘরেই শিশুকে বেশীক্ষণ রাখিবে। শিশুর সুখ-সুবিধা সর্ব্বাগ্রে, তা'রপর পরিবারের অন্য সকলের সুখ সুবিধা দেখিবে। শিশু যাহাতে ভাল থাকে সেই দিকে পরিবারের সকলেই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখিবেন। একটি চারাগাছকে অন্ধকারে রাখিলে তাহা যেরূপ শুকাইয়া যায়, শিশুকেও অন্ধকার ও বায়ুচলাচলহীন স্থানে রাখিলে সে সেইরূপ অকালে শুকাইতে থাকে। আমাদের দেশে রৌদ্রের অভাব নাই। কিন্তু সহরের জনাকীর্ণ পল্লীর অন্ধকার-বাড়ীগুলির মধ্যে এমন অনেক ঘর আছে, যে, সেই ঘরে কখনো রৌদ্র প্রবেশ করে না। এই কারণে ম্যালেরিয়া শূণ্য পল্লীগ্রামের রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে শিশু যেমন বেশ সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে, সহরে তেমন হইবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুকে পল্লীগ্রামের রৌদ্র ও বিশুদ্ধ বায়ুর মধ্যে রাখিতেই পরামর্শ দেন।

শিশুর ঘরে যে সমস্ত দ্রব্যাদি থাকিবে তাহা যেন বেশ পরিষ্কার করিয়া ধৌত করা যায়। এমন কোন জিনিস রাখিবে না যাহা ধৌত করিলে নষ্ট হইতে পারে। ঘরে শিশুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কোন বাহুল্য জিনিস বা অধিক গৃহসজ্জার দ্রব্য রাখিবে না। তাহা হইলে অধিক ধূলা জমিয়া তাহাতে রোগের বীজাণু স্থান পাইতে পারে। ঘরে শিশুর আনন্দদায়ক এবং চক্ষের তৃপ্তিকর বর্ণে রঞ্জিত নানা প্রকার পশুপক্ষীর ছবি রাখিলে শিশু আমোদ পাইতে পারে এবং শিক্ষাও হয়। শিশুকে যে খেলানা দিবে তাহা যেন বেশ নরম হয় এবং ময়লা হইলে ধৌত করা যায়। কোন প্রকার রঙ মাখান খেলানা শিশুকে কখনো দিবে না। শিশুকে এমন খেলানা দিবে যাহা তাহার পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হয়। যাহা পায় তাহাই মুখে দেয়। রঙ মুখে গেলে শিশুর ঘোরতর অনিষ্ট হইতে পারে।

দিবাভাগে শিশুর ঘরের জানালা-দরজা সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিবে। রাত্রিতেও একটি দরজা বা জানালা খুলিয়া রাখিবে, যাহাতে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের মধ্যে আসিতে পারে। শিশুর ঘরে অধিক লোক শুইবে না। অনেক লোকের শ্বাস প্রশ্বাসে ঘরের বায়ু শীঘ্রই বিষাক্ত হইয়া উঠে এবং সেই বায়ু শিশুও টানিয়া লয়। ইহাতে তাহার স্বাস্থ্য শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। শিশুর ঘরে কেবল শিশু এবং তাহার মাতা পৃথক শয্যায় শুইলেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয়।

শিশুর ওজন।

সুস্থ সবল শিশুর ওজন কত হওয়া উচিত তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে প্রত্যেক মাতা বুঝিতে পারিবেন।

বয়স	ওজন
জন্মকালে	৩½ সের
এক মাস	৪½ „
দুই মাস	৫½ „
তিন মাস	৬ „
চারি মাস	৬½ „
ছয় মাস	৮ „
এক বৎসর	১১½ „

(জন্মকালীন ওজনের তিন গুণ)

জন্মিবার প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনে শিশুর ওজন জন্মকালের ওজন অপেক্ষা কমিয়া যায় কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার বাড়িয়া উঠে। উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল সাধারণতঃ শিশুর ওজন গড়ে ঐরূপ হয়। অকাল-প্রসূত শিশুর ওজন এবং আকার ইহা-পেক্ষা অনেক কম হয়। ৭।৮ মাসে প্রসূত শিশুর ওজন কখন কখন ১½ সের হইতে দেখা যায়। এরূপ শিশু প্রায়ই বাঁচে না! কিন্তু ২ সের ওজনের শিশুকে কোন কোন মাতা সুস্থ সবল করিয়া বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন এরূপ দেখা গিয়াছে! এরূপ মাতা সবিশেষ প্রশংসার্হ। সুস্থ শিশুর ছয় বৎসর বয়সের সময় তাহার ওজন জন্মকালীন ওজন অপেক্ষা ছয়গুণ অধিক হইবে। কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে, কেবল ওজনের আধিক্যই শিশুর সবলতা ও সুস্থতার পরিচায়ক নহে। অনুপ যুক্ত শ্বেতসার বিশিষ্ট পদার্থ খাইলেও শিশু মোটা ও ভারি হইতে পারে, কিন্তু তাহার মাংস পেশী ও হাড় দৃঢ় না হইলে তাহা সুস্থতার পরিচয় দেয় না। অতএব মাতা দেখিবেন যে, শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার মাংসপেশী ও হাড় দৃঢ় হইতেছে কিনা।

জন্মের প্রথম ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে শিশুর ওজন যদি না বাড়ে তাহা হইলে তাহার খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। শিশু যদি মাতৃ দুগ্ধই খায়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মাতার দুগ্ধ ভাল নহে, সুতরাং মাতার দুগ্ধের উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইতে হইবে কিংবা বুঝিতে হইবে যে, মাতার দুগ্ধ শিশু তেমন উপযুক্ত রূপে পাইতেছে না। অথবা অন্য কোন কারণ থাকিলে তাহা বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইবে। দুর্ব্বল শিশুরা মাতার দুগ্ধ তেমন টানিয়া খাইতে পারে না বলিয়া অনেক সময় দেহবর্দ্ধনোপযোগী খাদ্য পায় না। এইরূপ শিশুদিগকে মাতার দুগ্ধের সহিত অন্য দুগ্ধ দিতে হইবে।

শিশুর দেহ সন্তোষজনকরূপে বাড়িতেছে এবং পুষ্ট হইতেছে কিনা তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) শিশুর ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে

(২) থলথলে না হইয়া দৃঢ় হইবে এবং চর্ম্মের রঙ পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজ্ঞাপক হইবে।

(৩) শিশু সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত থাকিবে।

(৪) তাহার সুনিদ্রা হইবে।

(৫) নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

৬। উপযুক্ত সময়ে দন্তোদ্গম হইবে।

(৭) দ্বিতীয় বর্ষের শেষ ভাগে মস্তকের দুই ভাগ জুড়িয়া যাইবে।

(৮) নবম মাসের শেষে শিশু বসিতে পারিবে। শিশু নিজে বসিতে পারিবার পূর্ব্বে তাহাকে কখনো বসাইবে না, বসাইলে সর্ব্বদা ঠেস দিয়া বসাইবে।

(৯) একাদশ মাসে শিশু হামাগুড়ি দিবে।

(১০) দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভেই হাঁটিতে

পারিবে। শিশু নিজে হাঁটিবার পূর্ব্বে তাহাকে জোর্ করিয়া হাঁটাইবে না।

বল পাইলে সে নিজেই হাঁটিবে। অনেক শিশুকে জোর করিয়া হাঁটাইতে গিয়া চির-জীবনের মত বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

(১১) দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি কথা বলিবে।

সুস্থ শিশুর সম্বন্ধে এই নিয়মগুলি সাধারণতঃ খাটে। দুর্ব্বল, রুগ্ন, অকালপ্রসূত শিশুদের কথা স্বতন্ত্র, তাহাদের সম্বন্ধে কোন নিয়মই নাই। ৭।৮ মাসে প্রসূত শিশু সাধারণ শিশু অপেক্ষা অনেক দেরীতে কথা বলে ও হাঁটে।

শিশুর কোষ্ঠ কাঠিন্য।

শিশুর শারীরিক অবস্থা শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার আছে কিনা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। দাস্ত অনিয়মিত হইলে কিংবা দাস্তে দুগ্ধের ছানার সাদা সাদা অংশ থাকিলে শিশুর খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশুর খাদ্য পরিপাক হইতেছে না, যকৃতের ক্রিয়া ভাল-রূপে হইতেছে না।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শিশুর অন্ততঃ একবার দাস্ত হওয়া উচিত, চারি পাঁচবার হইলেও ক্ষতি নাই। দাস্তের প্রকৃতি (character) ও রং যেমন হইবে—তদনুসারেই শিশুর সুস্থতা ও অসুস্থতা বুঝিতে হইবে। বারে অধিক হইলেও দাস্ত যদি ভাল হয় তবে ক্ষতি নাই।

শিশুর জন্মের পর কয়েকদিন পর্য্যন্ত এক প্রকার কাল, গন্ধহীন, আলকাতরার ন্যায় পদার্থ বাহির হয়। ইহাই শিশুর প্রথম দাস্ত। এইরূপ দাস্ত দিনে তিনবার হইতে ছয়বার হয়। ইহার ইংরাজি নাম maconiuni এই পদার্থ দ্বারা বিধাতা শিশুর জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার পাকস্থলীর delicate lining আচ্ছা-দিত করিয়া রাখেন। ইহা বাহির করিবার জন্য কখনো কোন জোলাপ দিবে না এবং তাহার প্রয়োজনও হয় না। শিশুর জন্মের পরই মাতার দুগ্ধ আঠার মত থাকে, দুগ্ধের মত তরল হয় না। এইরূপ দুগ্ধ পান করিলেই শিশুর পেটে যত কাল পদার্থ থাকে সব বাহির হইয়া যায়। ইহা সব বাহির হইয়া গেলে সুস্থ শিশুর দাস্তের রঙ হরিদ্রাবর্ণের এবং নরম হয়। এইরূপ দাস্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশুর কোন অসুখ নাই।

কঠিন, শুষ্ক, crumlely দাস্ত হইলে বুঝায় যে, শিশুর মেদময় খাদ্যের আবশ্যক। সবুজ বর্ণের দাস্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশু যে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে তাহা তাহার পক্ষে অনুপযোগী অথবা তাহার পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।

Slimy দাস্ত হইলে বুঝায় যে, তলপেটে inflammation কিংবা কোন গোলমাল হইয়াছে। সাবান জলের পিচকারী দিলেও এইরূপ দাস্ত হয়। জলের মত দাস্ত হইলে পেটের অসুখ বুঝায়।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ দুইটি হইতে পারে।

(১) শিশুর bowels দুর্ব্বল হইতে পারে।

(২) শিশুর খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে মেদময় পদার্থ (fat) নাই।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য (constipation) কখনো থাকিতে দিবে না। পনের দিনের হইলেই প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে শিশুর কোষ্ঠ যাহাতে পরিষ্কার হয়—এরূপ অভ্যাস করাইবে। প্রতিদিন কয়েকমিনিট ধরিয়া শিশুর পেটের

উপর হাত দিয়া ঘর্ষণ করিলে কোষ্ঠকাঠিন্যের উপকার হয়। মাতা—শিশুকে কোলের উপর শোয়াইয়া পেটের দক্ষিণদিকের নিম্নদেশ হইতে উপর দিকে নাভির উপর দিয়া বাম দিকের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ঘর্ষণ করিবেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এইরূপ দশমিনিট ধরিয়া করিলে বেশ উপকার দেখা যায়। বয়স্ক বালক বালিকাদিগেরও এই প্রথাতে বেশ উপকার হয়।

মাতৃদুগ্ধে পালিত শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য মাতার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য হয়। মাতার খাদ্যে মেদময় পদার্থের অভাব—তাঁহার কোষ্ঠ কাঠিন্যের কারণ। সুতরাং মাতা বিশেষ ভাবে তাঁহার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং যাহাতে তাঁহার দাস্ত নিয়মিত হয় তিনি তাহা দেখিবেন। তাহা হইলেই শিশুরও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইবে। মাতা অনাবশ্যক রূপে জোলাপ লইবেন না। যদি কখনো তাহার প্রয়োজন হয়, তবে মৃদু জোলাপ লইবেন, যাহাতে শিশুর কোন অনিষ্ট না হইতে পারে।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে তাহাকে—

(১) কডলিভার অয়েল ½ চামচ দিনে তিনবার দেওয়া। প্রয়োজন হইলে মাত্রা বাড়ান যাইতে পারে।

(২) গরম জল কিংবা ফুটন্ত জল ঠাণ্ডা করিয়া বড় চামচের এক চামচ আহারের মাঝখানে দিনে তিনবার দিলে উপকার হয়। প্রাতঃকালের আহারের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে গরম জল পান করাইলে শিশুর দাস্ত পরিষ্কার হয়।

(৩) ফলের রস শিশুর পক্ষে খুব উপকারী। আঙ্গুর, কমলালেবু, ফিগ সিদ্ধ করিয়া তাহার রস এক চা চামচ শিশুকে দিবে।

(৪) কালমেঘের পাতার রস ১০ ফোঁটা হইতে ৩০ ফোঁটা কিংবা পাতা বাটিয়া বড়ি করিয়া একটা বড়ি খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

(৫) আমাদের দেশে শিশুকে প্রথম মাস হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত আলুইয়ের বড়ি খাওয়ান হয়। ইহা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইহাতে তাহার যকৃতের কার্য্য ভাল হয়।

সময় সময় পিচকারি দিয়া দাস্ত করাইবার প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিক উপায়ে এবং ঔষধ দিয়া দাস্ত না হইলে তবে পিচকারী দিবে। লবণ জলের পিচকারী দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। গ্লিসারিণ এবং সাবান জলের পিচকারী দিলে পেটে irritasion হয়। কখনো glyccrine এবং সাবান জলের পিচকারী শিশুকে দিবে না। এক পাইণ্ট অল্প গরম জলে এক চা-চামচ লবণ মিশাইয়া সেই জলের এক চা-চামচ হইতে আট চা চামচ লইয়া পিচকারী দিবে। লবণ জল bowelsকে tone করে এবং কখনো irritate করে না। শিশুকে কখনো castoroil দিবে না। ইহা পেটের মাংসপেশীকে শক্ত করে বলিয়া শিশুর আরো কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। শিশুকে পিচকারী দিয়া দাস্ত করাইবার অভ্যাস করাইবে না। যখন অন্য কোন উপায় না থাকিবে তখনই কেবল পিচকারী দিবে।

(ক্রমশঃ)

অস্ত্রোপচার।

—:*:—

ডাঃ শ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য্য—এল্, এম্, এস্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। হার্ণিয়া সেরিব্রাই, মস্তিষ্কের শোথ।

হার্ণিয়া সেরিবাই অর্থাৎ মস্তিষ্ক বাহির হওয়ার কারণ—

আভ্যন্তরিক সঞ্চাপ দূরীভূত না হওয়া। পচন দোষের জন্য প্রায়ই ইহা হইয়া থাকে। এইরূপ উপসর্গ উপস্থিত হইলে, অভ্যন্তরে কোথায় সঞ্চাপ রহিয়াছে—তাহার অনুসন্ধান সর্ব্বাগ্রে করিবে। কেননা সেই কারণ দূরীভূত করিতে পারিলেই মস্তিষ্ক আপনা হইতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে।

মস্তিষ্কের যে অংশ বাহির হইয়া পড়ে, প্রায়ই দেখা যায়, তাহার ভিতরে পুয সঞ্চিত থাকে, কখনও বা ছোট ফুস্‌কুড়ির মতও দেখিতে পাওয়া যায়। সে পুয বাহির করিয়া দিলেই কারণ দূরীভূত হয়।

মস্তিষ্কের হার্ণিয়ার অধিকাংশই গ্রানুলেশন বিধান দ্বারা গঠিত হয়, মস্তিষ্কের বিধান খুব কমই থাকে, সুতরাং তাহা স্ক্রেপ করা চলে। স্ক্রেপের পর সেইস্থানে কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ প্রয়োগ করা যায়। এজন্য রোগীকে 'ক্লোরফর্ম্ম" করিবার প্রয়োজন হয় না। কেননা মস্তিষ্কের বহির্গত অংশ নিজেই সংজ্ঞাহীন।

মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে একটি আলোক বিহীন কক্ষে স্থির ভাবে শোয়াইয়া রাখিবে। রোগীকে কথা কহিতে দিবে না, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেও দিবে না।

অন্ত্র পরিষ্কারের জন্য –তেউড়ী মূল বা হরীতকী মূলের জোলাপ দিবে। ডাক্তারী মতে 'ক্যালোমেল দিবার ব্যবস্থা।

কিন্তু, ডিউরামেটারের রক্তস্রাব জন্য ট্রিফাইনি, করিলে, এত সাবধান হইবার দরকার করে না, এরূপ অস্ত্রোপচারের পরই রোগী উঠিয়া বসিতে পারে। ঘা শুকাইলেই রোগী আরোগ্য হইল—ইহাও মনে করা চলে।

অস্ত্রোপচারের পর প্রদাহ উপস্থিত হইলে, দেহের উত্তাপও খুব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এরূপ ঘটনা প্রায় তৃতীয় দিবসে ঘটিয়া থাকে।

মস্তিষ্ক বিধানের যে কোন অস্ত্রোপচার হউক না কেন, অস্ত্রোপচারের পর ৫।৬ মাস মস্তিষ্ক পরিচালনার কার্য্য হইতে বিরত থাকা উচিত। অন্ততঃ ২।৩ মাস পড়া শুনা করা একেবারেই ছাড়িতে হয়।

হেয়ারলিপ অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, পচন, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, শ্বাসরোধ।

এইরূপ অস্ত্রোপচারের পর, যে স্থলে—

অস্থি সংশ্লিষ্ট হয় সেই স্থলে—কখনও সামান্য পচন দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ রোগীর বলরক্ষার জন্য পথ্যের বিধিমত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রোগীর মুখ গহ্বর পরিষ্কার রাখাও দরকার।

শ্বাস কৃচ্ছ্রের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগীর অধর নিম্ন দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে। এইরূপ মাঝে মাঝে করিলে, সহজে মুখের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে।

হেয়ার পিন প্রয়োগ করা হইয়া থাকিলে অস্ত্রোপচারের দ্বিতীয় দিনে উহা বাহির করিয়া লইবে। যদি রৌপ্যতার (ফিস্‌গাট) দিয়া সেলাই করা হইয়া থাকে, তবে তাহার একটী তৃতীয় দিবসে, অপরটি পঞ্চম দিবসে খুলিয়া দিবে। কর্ত্তিত স্থানের উভয় পার্শ্ব পরস্পর সম্মিলনের উদ্দেশ্যে যে সূক্ষ্ম সেলাই করা হইয়া থাকে,—এক সপ্তাহের পর তাহা দূর করা উচিত, তবে ইতিমধ্যে যদি সেলাই জনিত স্ফোটকের উৎপত্তি হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সূত্র খুলিয়া ফেলিবে। ইহাতে—কর্ত্তিত স্থান ফাঁক হইয়া যাইতে পারে। তজ্জন্য, একখণ্ড এবিলিভ প্লাষ্টার এরূপ ভাবে কাটিয়া লইবে, যে, তাহার সংকীর্ণ অংশ নাসারন্ধ্রের নিম্নে এবং প্রশস্ত অংশ দ্বয় গণ্ডে সংলগ্ন করিয়া রাখা চলে। ইহাতে ক্ষতমুখ বিস্তৃত হইবার ভয় থাকে না।

সেলাই করার সূত্র খুলিবার সময়—খুব সাবধান হইবে, যেন টান লাগিয়া ক্ষত স্থান বিস্তৃত না হয়।

ক্লেপ্ট প্যানেট।

উপসর্গ। হুপিং কফ, জ্বর অতিসার। কিন্তু, এ সকল উপসর্গ যাহাতে না উপস্থিত হয়—সে জন্য খুব সতর্ক থাকিতে হইবে। কাসি উপস্থিত হইলে, অস্ত্রোপচার নিষ্ফল হইয়া যায়।

গ্রীবার অস্ত্রোপচার।

ট্রেকিওটমী ও লেরিঙ্গোটমী।

উপসর্গ। এম্ফাইসিমা, ট্রেকিয়ায় ক্ষত, ক্ষত বিগলন।

অনেক সময় অস্ত্রোপচারের দোষে অথবা ট্রেকিয়ার মধ্যে নল সংস্থাপিত না হওয়ায় এম্ফাইসিমা উপস্থিত হয়। অতএব যদি এম্ফাইসিমা হয়—তবে নল বাহির করিয়া লইয়া আবার তাহা ভাল করিয়া প্রবেশ করাইবে। ধাতব নল—বেশী দিন রাখিলে ট্রেকিয়ার মধ্যে ঘা হইতে পারে। সুতরাং তাহা মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিবে। এক সপ্তাহের বেশী কখনও ধাতু নির্ম্মিত নল রাখিবে না। যদি সপ্তাহের অধিক কাল নল রাখার আবশ্যক হয়, রবারের নল ব্যবহার করিবে, এক এক ব্যক্তির গ্রীবার গঠন এক এক প্রকৃতির, তজ্জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির গঠনের নল নির্ব্বাচন করিয়া লইবে।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সঞ্চাপ জন্য ট্রেকিয়ার ক্ষত হইলে, ফিতা শিথিল করিয়া দিয়া বর্ণ বিশিষ্ট মলম বা গজ দ্বারা ক্ষত চিকিৎসা করিবে। যদি বিগলন বিস্তৃত হইতেছে দেখ, তবে কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ বা লাইট্রেট্ অফ সিল্‌ভার—প্রয়োগ করিবে।

লেরিংক্স প্রসারণ—

প্রথমে রোগিকে ক্লোরফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া ট্রেকিয়ার ক্ষত প্রসারিত করতঃ সেই পথে খুব নরম রবারের ক্যাথিটার লেরিংক্সের

মধ্য দিয়া মুখের ভিতর চালিত করিবে। মুখের মধ্যে একটু আসিলে, ক্লিপ দিয়া তাহা ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিয়া আনিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটু একটু বড় ক্যাথিটার প্রবেশ করাইয়া উপযুক্ত পরিমাণে প্রসারিত করিয়া লইবে। কিম্বা ঐরূপ ক্যাথিটারের ভিতর দিয়া ট্রেকিচার ক্ষত পথে রেশম সূত্র প্রবেশ করাইয়া সূত্রের নীচের দিকে একখণ্ড কোমল স্পঞ্জ বাঁধিয়া সূত্রের অপর দিক মুখের ভিতর দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইবে। ইহাতে লেরিংক্সের ময়লা সমস্তই পরিষ্কার হইয়া যায়। ম্যাকেওলের টিউব—এ কার্য্যের উপযোগী।

ইসোফেজিওটমী।

এই অস্ত্রোপচারের পর—রোগীকে কিছু খাওয়ান বড় কঠিন সমস্যা। ডাক্তারেরা প্রথম ৩ দিন মলদ্বার দিয়া পথ্য প্রয়োগ করেন। ইহারই বাঙ্গালা সংজ্ঞা—"সরলান্ত্র পথে পথ্য প্রয়োগ।" এরূপ ভাল পথ্য প্রয়োগ অসম্ভব ব্যাপার। আমি কোথায়ও সফলকাম হই নাই। বরং মুখ পথে বা নাসিকা পথে একটি কোমল রবার নল ইস্যাফ্যোম্ মধ্যে চালাইয়া তাহার মধ্য দিয়া পথ্য প্রয়োগ করিয়াছি। এইরূপ নল সকালে চালাইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাখিয়াছি, তাহার মধ্য দিয়া ৫।৬ বার জলীয় পথ্য রোগীকে খাওয়াইয়াছি।

১ সপ্তাহ পরে মুখপথ দিয়া তরল পথ্য প্রয়োগ করা যায়।

ক্ষতের নিম্নাংশ হইতে যাহাতে স্রাব নির্গত হইতে পারে, সেজন্য ড্রেনেজের ব্যবস্থা করিতে হয়। নতুবা ক্ষত হইতে রোগ-জীবাণু সংক্রমিত হইতে পারে,—কেননা এরূপ ক্ষত প্রায়ই পচন দোষযুক্ত হইয়া থাকে।

থাই রইড্ গ্রন্থির অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। বাক্‌রোধ, গ্রীবার সেলুলাইটিস্, থাইরইডিজম্।

১। রেকারেণ্ট লেরিঞ্জিয়াল স্নায়ু অস্ত্রোপচার জন্য আহত অথবা ২। ক্ষত শুষ্ক বিধানের সঙ্গে জড়িত হইলে, বাক্‌রোধ উপসর্গ উপস্থিত করে। প্রথম কারণে—অস্ত্রোপচারের সঙ্গে সঙ্গেই বাক্‌রোধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণে কিছু বিলম্বে বাক্-রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

গ্রীবার সেলুলাইটিস্—অতি ভয়ানক উপসর্গ। ইহাতে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। এ উপসর্গ উপস্থিত হইবামাত্র—ক্ষত উন্মুক্ত করিয়া দিবে—যেন স্রাব বদ্ধ হইয়া না থাকে, বাহির হইয়া যায়।

'থাইরই ডিজম্' উপস্থিত হইলে এক্স অফ থানমিক গাইটারের লক্ষণ—অস্ত্রোপচারের ২।১ দিন পরেই দেখা দেয়। জ্বর খুব প্রবল হয়—১০৩, ১০৫ পর্য্যন্ত। এত উত্তাপ—গায়ে হাত দেওয়া যায় না। হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য অতি দ্রুত হইয়া থাকে, মুখ মণ্ডল রক্তোজ্জ্বল, নাড়ী স্থূলা—পূর্ণ বেগবতী, রোগী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে।

অনেক সময়—ক্ষত পচনদোষ সংসৃষ্ট হইলেও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। তবে, পচন দোষে হৃদ্‌পিণ্ডের গতি দ্রুততর হয় না। ২।১ দিন থাকিয়া ক্রমশঃ এই সকল লক্ষণ তিরোহিত হইয়া যায়, তখন আর ভয়ের কারণ থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ উপস্থিত হইবামাত্র—

ক্ষত উন্মুক্ত করিয়া দিবে, জল দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে, পরে গজ দ্বারা এরূপ ভাবে পরিপূর্ণ করিবে—যেন গ্রন্থির স্রাব ক্ষত মধ্যে সঞ্চিত হইয়া লিম্প্যাটিক কর্ত্তৃক শোধিত না হয়। অত্যন্ত কঠিন রোগীর পক্ষে ট্র্যান্স ফিউসন প্রয়োজন হইতে পারে। এই জন্য কখন কখন রোগীর মৃত্যুও হইয়া থাকে।

বক্ষঃ বিবরের অস্ত্রোপচার।

স্তন উচ্ছেদ।

উপসর্গ। ফুস্‌ফুসের রোগ, ত্বকের পচন, পচন সংক্রমণ।

ক্ষত মধ্যে ড্রেনেজ টিউব প্রভৃতি না দেওয়া হইলে, ক্ষতের ভিতরে শিথিল কৈশিক বিধান মধ্যে রক্ত সঞ্চিত হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য—রোগিণীকে ২৪ ঘণ্টাকাল, তাহার সুস্থ পার্শ্বের দিকে শুইয়া থাকিতে বলিবে। কিন্তু স্রাব নির্গত হইবার ব্যবস্থা থাকিলে,—এরূপ শুইয়া থাকিবার আবশ্যক নাই। অস্ত্রোপচারের পর অত্যন্ত বেদনা লইলে, ¼ গ্রেণ মর্ফিয়া অধস্ত্বাচিক প্রণালীতে প্রয়োগ করিবে।

প্রথম ২৪ ঘণ্টা অতি অল্প রক্ত নির্গত হইয়া ক্ষতের পটী সিক্ত হইয়া থাকে। এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। পটীর আর্দ্র স্থানে তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে।

অস্ত্রোপচারের পর—রোগিণীকে তাকিয়া হেলান দিয়া ২ দিন পর্য্যন্ত বসাইয়া রাখিলে, তাহার ফুস্‌ফুসের কোন রোগ বড় একটা হয় না।

স্তন উচ্ছেদের পর—ফুস্‌ফুসের রোগ—প্রায়ই হইয়া থাকে। বেশী বয়সে স্তনের কাসিনোমা পীড়া বেশী হয়। এই পীড়ায় স্তন উচ্ছেদ না করিলে চলে না। ব্যাণ্ডেজ দ্বারা কষিয়া বাঁধা থাকায়, বক্ষঃস্থল যথোপযুক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে না। অধিকন্তু বক্ষঃস্থলে বৃহৎ ক্ষত থাকায় রোগিণী নিশ্বাস গ্রহণের সময় যন্ত্রণা অনুভব করে। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণেও ব্যাঘাত ঘটে। কাজেই ফুস্‌ফুসের রোগ হওয়া অনিবার্য্য। অনেক স্থলেই দেখিয়াছি—অস্ত্রোপচার সন্তোষজনক হইয়াছে,—রোগিণী কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

অস্ত্রোপচারের পরই বাহু সেই পার্শ্বে আবদ্ধ করিয়া দিয়া হস্ত ব্যাণ্ডেজের ক্লোভহিচ দ্বারা গ্রীবা বেষ্টন স্থির রাখা আবশ্যক। যদি স্লিং দ্বারা হস্ত স্থির রাখার ব্যবস্থা করা যায় তবে তাহা স্কন্ধ না কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখা কখনই উচিত নহে। কারণ তাহাতে টান পড়িয়া ক্ষতের সেলাই ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

স্রাব নির্গত হইবার জন্য ড্রেণেজ টিউবের ব্যবস্থা করিলে, দ্বিতীয় দিবসেই তাহা খুলিয়া লইবে, পটির পরিবর্ত্তন করিবে। অস্ত্রোপচারের ৩।৪ দিন পরে—বাহু এপাশে ওপাশে একটু একটু সঞ্চালিত করিতে হইবে। ১৫ দিন পর্য্যন্ত অতি সাবধানে একার্য্য করিতে হয়, ক্রমে অধিক পরিমাণে সঞ্চালিত করিতে হয়।

সেলাইয়ের কিয়দংশ অস্ত্রোপচারের সপ্তাহ পরে এবং বাকি অংশ পক্ষকাল পরে কাটিয়া দিবে। ঘা' শুকাইলে গভীর স্তরস্থিত বিধান যাহাতে পরিচালিত হইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিলে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রোগিণীর দিকে দৃষ্টি রাখিবে, কেননা পীড়ার লক্ষণ পুনরায় দেখা দিতে পারে।

স্তনের সহিত অনেকটা ত্বক্ উচ্ছেদ করিয়া, অবশিষ্ট ত্বক্ খুব টানিয়া সেলাই করিয়া দিলে, কর্ত্তনের পার্শ্বদেশের ত্বক পচিয়া গলিয়া যাইতে পারে। এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেলাই কাটিয়া দিবে। তাহাতে ক্ষত মুখ ফাঁক হইয়া যাইবে। বরং সেই ক্ষত স্কিন্ গ্রাফ্টিং দিয়া পূর্ণ করিবে।

পচন সংক্রমণ স্তন উচ্ছেদের বিপজ্জনক উপসর্গ। ক্ষত বৃহৎ এবং বিস্তর লসিকাবহা উন্মুক্ত থাকায় সহজেই রক্ত দূষিত হইয়া পড়ে। ফুস্‌ফুস্ আবরক ঝিল্লীর মধ্যে রস সঞ্চিত হইয়া তাহা পূয়ে পরিণত হইতে পারে।

এম্পাইমার অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। ফুস্‌ফুসের প্রসারণের অভাব, চিরস্থায়ী শোষ (নালীঘা) অপর পার্শ্বে পূয়োৎপত্তি। মস্তিষ্কের স্ফোটক। মেরুদণ্ডের বক্রতা।

(ক্রমশঃ)

সুস্থদেহে মাদকদ্রব্যের আবশ্যকতা আছে কি না ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অহিফেন।

অহিফেন প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ছিলনা বা ব্যবহৃত হইত না, কেননা প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থে অহিফেনের নাম বা ব্যবহার নাই। অনেকে বলেন যে, প্রাচীনগ্রন্থে যে সকল নির্য্যাস ও ক্ষীর (আঠা) বিষের উল্লেখ, আছে, তন্মধ্যে কোনটি অহিফেন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ অহিফেন প্রাচীন কালে যদিও অন্য নামে অভিহিত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে উদরাময়াদি রোগে অবশ্যই তাহা ব্যবহৃত হইত কিন্তু ঐ সকল রোগের চিকিৎসায় অহিফেনের ন্যায় কোনো দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায় না। "ভাবপ্রকাশ।" "রসেন্দ্রসার সংগ্রহ" প্রভৃতি নাতি প্রাচীন কালের গ্রন্থে অহিফেনের ব্যবহার দেখা যায়।

অহিফেন পূর্ব্বে ছিল না বলিয়া অহিফেন সম্বন্ধে প্রাচীন মতও লভ্য নহে। সুতরাং অহিফেন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কি বলিয়াছেন নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

অহিফেনের একটি প্রধান গুণ এই যে, উহা উত্তেজিত ধমনী-বিতানকে (Nervous system) প্রকৃতিস্থ করিয়া সর্ব্ব প্রকার যাতনার সত্বর প্রশমন করে, এইজন্য লোকে প্রথমে কোন কষ্টকর বেদনা নিবারণের জন্য অহিফেন ব্যবহার করিয়া ক্রমে উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর আর অহিফেন পরিত্যাগ করিবার উপায় থাকে না।

অহিফেন সেবনে অভ্যস্ত হইলে ইন্দ্রিয় সকল, দেহ ও মন ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়ে, কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, কেবল বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, সুনিদ্রা হয় না, কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় না, উদরে বায়ু সঞ্চার হয়, ক্ষুধা কমিয়া যায়, পুরুষত্ব নষ্ট হয়, শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত জড়তা হয়।

ডাক্তার কেলরা এম, ডি, বলিয়াছেন যে, চা কফি, তামাক বা মদ্য দীর্ঘ কাল ব্যবহার করিলে যেরূপ অপকার হয়—দীর্ঘকাল অহিফেন ব্যবহার করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণেই অপকার হইয়া থাকে।

অধ্যাপক রসিওয়েলার বলেন যে, অহিফেন বিপজ্জনক নার্কটিক নামক বিষ, যে ব্যক্তি অহিফেন সেবন করে সে চিরদিন অহিফেনের দাস হইয়া থাকে। ঐ রূপ দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করা একরূপ অসম্ভব। এইজন্য অহিফেন সেবন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অনেক বলেন যে, একটু বয়স হইলে কোন এক প্রকার মাদকদ্রব্য—বিশেষতঃ অহিফেন সেবন করা ভাল, কিন্তু যে বয়স হউক সুস্থ শরীরে অহিফেন বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ উহাতে শরীরের অনিষ্ট ব্যতীত উপকারের কোন সম্ভাবনা নাই।

অহিফেন যে কিরূপ অনিষ্টকর পদার্থ তাহা চীন দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সুন্দর রূপে উপলব্ধি হইবে। অহিফেন ব্যবহার করিয়া প্রাচীন পরাক্রান্ত চীন জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা অহিফেনের অনিষ্টকারিতার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।

অহিফেন হইতে গুলি এবং মরফিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহারা সাধারণ অহিফেন অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর। গুলি খাইলে শরীর জীর্ণ শীর্ণ এবং কুৎসিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য গুলিখোরের মত চেহারা আমাদের দেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত।

গাঁজা, চরস ও সিদ্ধি।

এই সকল মাদক দ্রব্য সেবন করিলে অজীর্ণ, উদরে বায়ু সঞ্চয়, মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য, শিরো ঘূর্ণন, কোষ্ঠবদ্ধতা, সুনিদ্রার অভাব, মেজাজ খিট খিটে হওয়া, ক্রোধাধিক্য, অগ্নি মান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। গাঁজা খাইলে লোকের উৎসাহ ও কর্ম্ম পটুতা অত্যন্ত হ্রাস হয় বলিয়া আমাদের দেশে লোকে বলে যে, 'গাঁজা খেলে লক্ষী ছাড়ে।' আর গাঁজা খাইলে জীর্ণ শীর্ণ ও কদাকার হয় বলিয়া গাঁজা খোরের মত চেহারও বলা হয়। তামাক সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। গাঁজা ও চরস—তামাক অপেক্ষা অনিষ্টকারী। সুতরাং তামাকের অপকারিতাকে আর একটু গুরুতর ভাবে ধরিয়া লইলে গাঁজাও চরসের অপকারিতা বুঝা যাইবে। গাঁজা খাইয়া অনেক লোকে পাগল হইয়া যায়, সিদ্ধি—গাঁজা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম অপকারী।

মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা হইল—তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনেই শরীরের কোনরূপ উপকার হয় না, পরন্তু সমূহ অপকার হইয়া থাকে। সুতরাং সুস্থ শরীরে মাদক দ্রব্যের উপযোগীতা কিছু মাত্র নাই। কিন্তু ক্ষণিক মত্ততার লোভে লোকে অর্থব্যয় করিয়া মাদক দ্রব্য সেবন করে এবং

তাহার ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। যদ্যপি সর্ব্ব প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার পৃথিবী হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় রোগ, অকালমৃত্যু ও দারিদ্র্যের সংখ্যা অনেক পরিমাণেই কমিয়া যায় এবং পৃথিবীতে সুস্থ, সবল, নীরোগ ও দীর্ঘজীবির সংখ্যা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

ব্যায়াম-প্রসঙ্গ।

—০—

("হিন্দুস্থান হইতে উদ্ধৃত)

ব্যায়ামের প্রধান গুণ তাহা মাংসপেশীকে পরিপুষ্ট করে। মাংসপেশী কি? অতি সূক্ষ্ম তন্তুর সমষ্টি। এই তন্তুগুলি আপানা-আপনি সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে।

যে মাংসপেশী ব্যবহৃত হয় না, তাহার ভিতরের তন্তুগুলি বিবর্ণ ও কৃশ হইয়া পড়ে, এবং তাহাদের আকুঞ্চন ক্ষমতাও অনেকটা কমিয়া আসে।

কোন দুর্ব্বল ও কৃশ মাংসপেশী আকুঞ্চিত হইলে তাহার বিবর্ণতা শীঘ্রই দূর হইয়া যায়, তাহার মধ্যে উচ্ছ্বসিত রক্তধারা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে রাঙা করিয়া তোলে। সেই নূতন রক্তের মধ্যে যে পোষ্টাই পদার্থ থাকে. তাহার দ্বারা মাংসপেশীর তন্তুগুলি যথেষ্ট উপকার লাভ করে। এইভাবে নিয়মিত ভাবে বারংবার মাংসপেশীকে আকুঞ্চিত করিলে ক্রমেই তাহার আকার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ফলে সেই সঙ্গে দেহেরও বলবৃদ্ধি হয়।

আপনারা সকলেই বিখ্যাত বলবান স্যাণ্ডোর নাম শুনিয়াছেন। বাল্যকালে স্যাণ্ডো এত বেশী রোগা ছিলেন যে তাঁহার বাপ মা ছেলের জীবনের আশা রাখিতেন না। কিন্তু সেই স্যাণ্ডোই নিয়মিত ব্যায়ামের গুণে কয়েক বৎসরের মধ্যেই গায়ের জোরের জন্য সারা পৃথিবীতে নাম কিনিয়াছিলেন। শুধু গায়ের জোর নয়,—তাঁহার মতন সুগঠিত ও পরিপুষ্ট দেহও আর কাহারও দেখা যায় নাই।

বিলাতের বিখ্যাত ডাক্তার উইনসিপ মাংসপেশীর নিয়মিত পরিচর্য্যা সাধন করিয়া এমন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পূর্ণ সাঁইত্রিশ মণ কুড়ি সের ওজনের ভারি মাল কাঁধে করিয়া তিনি অনায়াসে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। খুব বলবান ভারবাহী অশ্বও এত ভারি মালের চাপ একেবারেই সহ্য করিতে পারিবে না। অথচ ডাক্তার উইনসিপও যৌবনে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। যার-তার হাতে অসহায় ভাবে মার খাইয়া শেষটা তিনি উঠিয়া পড়িয়া ব্যায়াম্ চর্চ্চায় লাগিয়া যান।

বলবান ও সুগঠন মাংসপেশীর মত যৌবনের উপযোগী সৌন্দর্য্য আর কিছুই নাই। দেহের বলে মানুষের মনের বলও বাড়ে,

এবং স্বাস্থ্য অটুট হইয়া মানুষকে সকল কাজেই সাহায্য করে। যাঁহারা মস্তিষ্ক-সংক্রান্ত কাজ করেন, তাঁহাদের পক্ষেও ব্যায়াম অত্যন্ত দরকার। কারণ, মস্তিষ্ক ও মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক যতদূর ঘনিষ্ঠ হইতে হয়। দেহকে অবহেলা করিলে মস্তিষ্ক মানুষকে বাঁচাইতে পারিবে না।

ব্যায়াম মানুষকে সুন্দর করে। কুঁজো, বেঁকেপড়া দেহ, সঙ্কীর্ণ বক্ষ, বিকৃত চলন-ভঙ্গী, ব্যায়ামের গুণে এ-সব অপূর্ণতা দূর হয়। মানুষের বক্ষঃস্থলের কাঠামো হইতেছে পার্শ্বাস্থিগুলি। ব্যায়ামের অভাবে সেগুলি বাহিরদিকে না আসিয়া, ভিতরদিকে দুমড়াইয়া যায়। কাজেই বক্ষঃস্থল সমতল হইয়া আমাদের নিঃশ্বাস-যন্ত্র ফুসফুসকে চাপিয়া ধরে। যাঁহারা কুড়ি-বাইশ বৎসর বয়সের ভিতরে ব্যায়াম সুরু করেন, তাঁহাদের দেহের এ সমস্ত দোষ একেবারেই থাকে না। বেশী বয়সে ব্যায়াম আরম্ভ করিলে, অতটা না হোক, দেহের গড়ন অন্ততঃ কিছু কিছু বদলাইয়া ফেলা যায়।

ব্যায়ামের গুণে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের অবস্থা অতিশয় উন্নত হয়। অন্য ব্যায়ামের কথা দূরে থাক, একবার মাত্র দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া আসিলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্যকারিতা দুগুণ ও ফুসফুসের কার্য্যকারিতা দুগুণের চেয়েও বেশী হইয়া দাঁড়ায়। হৃৎপিণ্ড দেহের সমস্ত তন্তুর মধ্যে রক্তসঞ্চার করে। হৃৎপিণ্ড যদি অধিক দ্রুত-তালে চলে, তবে রক্তের যোগানও বেশী করিয়া দিতে পারিবে। সেই রক্তের ধারায় যেমন পোষ্টাই পদার্থ থাকে, তেমনি তাহার দ্বারা দেহের ভিতরের ব্যবহৃত পদার্থের অকেজো কণিকাগুলি, ঠিক সেই সেই যন্ত্রের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়,—যে-সব যন্ত্রের কর্ত্তব্য হইতেছে, দেহের ময়লা সাফ করা। ফুসফুসের কার্য্যকারিতা বাড়িলে দেহের সমস্ত ধমনী শোণিতের মধ্যে অধিক পরিমাণে মহা-উপকারী 'অক্সিজেন' বা অম্লজানের যোগদান পাওয়া যায়। অম্লজান দেহের রক্ত ও তন্তুগুলির মধ্যে নূতন তেজ ও শক্তির সঞ্চার করে। ফলে সমস্ত দেহ নব-জীবনের উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি, মনের ধারণা-শক্তি, উদরের হজম শক্তি বাড়িয়া যায় এবং সমস্ত অবসাদ, নিশ্চেষ্টতা ও কর্ম্মে-বিরাগ একেবারে দূর হইয়া যায়। একালকার ব্যস্ততা ও কর্ম্ম জীবনের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, হৃৎপিণ্ড সতেজ ও নির্দ্দোষ এবং ফুসফুস বৃহৎ ও সুদৃঢ় হওয়া একান্ত আবশ্যক। আগেই বলিয়াছি, ব্যায়ামের দ্বারা মাংসপেশী পরিপুষ্ট হয় এবং সেইজন্যই ব্যায়ামের ফলে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কোনো রকম অপূর্ণতাই থাকিতে পারে না। যাঁহারা ব্যায়াম করেন, তাঁহারা বক্ষঃস্থলকে ইচ্ছা করিলেই অসম্ভব রকম বাড়াইয়া তুলিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্যাণ্ডোর নাম করা যায়। সহজ অবস্থায় তাঁহার বুকের মাপ আটচল্লিশ ইঞ্চি। কিন্তু ছাতি ফুলাইলে তাঁহার বুকের মাপ হয় বাষট্টি ইঞ্চি।

স্বর্গীয় কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত।

হুগলি জেলার অন্তর্গত তারকেশ্বর রেল-ষ্টেসনের ২ ক্রোশ ব্যবধানে দামোদর নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী ভাঙ্গামোড়া গ্রামে সন ১২৭৫ সালের ৬ই ফাল্গুন বিরাজচরণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মাধব চন্দ্র গুপ্ত। বিরজাচরণ তাঁহার তৃতীয় পুত্র। বিরজা চরণের পিতা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ভাঙ্গামোড়া ও তৎসন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহে সুচিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বিরজাচরণের বাল্যজীবন এই জন্য পল্লীগ্রামের আড়ম্বর বিহীন অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল। পল্লীগ্রামের সেই সরলতা, অকপটতা ও আড়ম্বরহীনতা—সহরে আসিয়াও বিরজাচরণের জীবনে অন্যরূপ ধারণ করে নাই।

পল্লীগ্রামের পাঠশালায় তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর তিনি গ্রাম্য-মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত লেখক ৺অম্বিকা চরণ গুপ্ত মহাশয় তৎকালে পুলিশ বিভাগে চাকরী করিতেন। বিরজাচরণ ও তাঁহার অন্যান্য সহোদরেরা জ্যেষ্ঠের কর্ম্মস্থল হাওড়া শিবপুর ও উলু-বেড়িয়ায় অবস্থিতি পূর্ব্বক ঐ সকল স্থানের ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

বিরজাচরণ এইরূপে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার পর তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে আবার প্রাচীন পল্লী ভাঙ্গামোড়ায় লইয়া যান্ এবং সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়াইবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু নানা কারণে ভাঙ্গামোড়ায় থাকিয়া অধ্যয়নের অসুবিধা হওয়ায় তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কেটেড়া গ্রামে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ইঁহার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়। কঠোর পরিশ্রমী-মেধাবী-বিরজা চরণ ৩ বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে কাব্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন এবং এক বৎসরের মধ্যেই কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ পূর্ব্বক তাঁহার কুলগুরু ভক্তি ভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট কিছুদিন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহা-মহোপাধ্যায় কবিরাজ স্বর্গীয় বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ইনি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহার ফলে ইঁহার আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা সমাপ্তির পর কোচবিহার নিবাসী জনৈক জমীদার পত্নীর চিকিৎসার্থ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে কোচবিহারে প্রেরণ করেন। সেই সময় কোচবিহার ষ্টেটের কবিরাজের পদ শূন্য হয়, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের চেষ্টায় বিরজাচরণ ঐ পদ লাভ করেন। কোচবিহার ষ্টেটে সে সময় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক রাখা হইত বটে, কিন্তু সমগ্র কোচ-

বিহার রাজ্যে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিরজা চরণের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখিয়া কোচবিহার রাজ্যের তদানিন্তন দেওয়ান রায় কালিকা দাস দত্ত সি, আই, ই বাহাদুর তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং যাহাতে সমগ্র কোচবিহার রাজ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে কোচ-বিহারে দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বিরজাচরণ এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত তিনি এই ভার রক্ষার পর কলিকাতায় আসিয়া স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

বিরজাচরণের প্রধান কীর্ত্তি "বনৌষধি দর্পণ।" এই গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে তিনি কোচ-বিহারে চেষ্টা করিয়া বনৌষধি উদ্যানের স্থাপনা করেন। প্রথমে ইহা ক্ষুদ্রভাবে আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ ইহার প্রসার বৃদ্ধি হয়। বনৌষধি দর্পণের উপাদান সকল এই উদ্যান হইতে কতক কতক সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে বনৌষধি দর্পণের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কোচবিহারের মহারাজা বাহাদুর ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশে সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। বিরজাচরণ কলিকাতায় আসার পর ১৯১৯ খৃঃ অব্দে বনৌষধি দর্পণের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

"বনৌষধি দর্পণ" ভিন্ন বিরজাচরণ আরও কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন "রসৌষধি দর্পণ" নামে একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের কিয়দংশ পাণ্ডুলিপি লিখিয়া তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের তিনি একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তৃগণের মধ্যে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সকল বিষয়ের অধ্যাপনার শক্তি তাঁহার মধ্যে এক সঙ্গে বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমান সালের ১লা মাঘ হইতে বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে তাঁহাকে ভাইস্ প্রিন্সিপ্যালের পদে আরূঢ় করা হয়, কিন্তু ২৬ দিন কার্য্য করার পরই আর তাঁহাকে একার্য্য করিতে হইল না, গত ২৬শে মাঘ রাত্রি ১১৷৷০ টার সময় তিনি সন্ন্যাস রোগে অনন্তধামে গমন করিলেন। তাঁহার বিয়োগে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, সেইরূপ প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সাধক সঙ্ঘেরও বিষম ক্ষতি হইয়াছে। কালে হয় তো তাঁহার অভাব আবার পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দারুণ সংঘর্ষ কালে বিরজাচরণের মত আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব—কম ক্ষতির কথা নহে। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি,—প্রশান্ত বদন,—মধুর স্নিগ্ধ হাস্য চিরকাল আমাদের মনে জাগরূক থাকিবে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। পত্নী, পাঁচটি পুত্র ও একটী বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগ-ব্যথা আমাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়াছে, কি বলিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আশ্বস্ত করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।

গত ৩রা ফাল্গুন আয়ুর্ব্বেদের সাধকপ্রবর বিরজাচরণের জন্য অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে এক শোক সভার অধিবেশন হইয়া-

ছিল। তাহাতে সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এস, এস, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি প্রভৃতি বিরজাচরণের অনেক গুণ-পরিচয় সভায় প্রকাশ করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্য চরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন রচিত একখানি শোক গীতি সভায় প্রথমে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল ; সে গীত খানি নিম্নে দেওয়া হইল।

এসেছিলে তুমি পুণ্য লগনে ধন্য প্রতিভা ল'য়ে।
ঢেলেছিলে শান্তি সুধার সলিল কত না ক্লান্তি স'য়ে
ক'রেছিলে মুগ্ধ কি যেন মন্ত্রে,
বেজেছিল গান সকল যন্ত্রে,
উঠেছিল নেচে হৃদয় তন্ত্রী সে গানে মোহিত হ'য়ে।
বেসেছিলে ভাল প্রাণ ভরিয়া—
ম্লান মু'খানি সবারি চাহিয়া,
ফুটাইতে হাসি শুষ্ক অধরে আশার কথাটি ক'য়ে।
কি জানি কি এক শক্তি আনিয়া
দিয়েছিলে ওগো তুমি যে ঢালিয়া,
সে শক্তি সাধনা ক'রে ছিল সবে তোমারি ভাবেতে র'য়ে।
এত দয়ারাশি সকলি ভুলিয়া
নিমেষের মাঝে গেলে গো চলিয়া ?
(কিন্তু) কীর্ত্তি তোমারি দীপ্ত রহিবে মর্ম্ম ভিতরে ব'য়ে।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয় এই উপলক্ষে স্বরচিত একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা এই —

হা হন্তাশান্তকাল ক্ষয়করজগতাং কালবোধানভিজ্ঞ !
কিং ক্রৌর্য্যং দুঃসহংনঃ প্রকটিতমধুনা ভোক্ত্বয়া মর্ম্মপীড়ি।
সংসারারামশোভাকরমতিপবিতং কীর্ত্তিসৌরভ্যহৃদ্যং
লোকালোকং জনেষ্টং নরবরকুসুমং ক্বাস্য গোপায়সে তৎ ॥
সংসর্গঃ খলু যস্য কাঙ্ক্ষিতসুখেষ্বাদ্যন্তমাপ্তশ্চিরং
মূর্ত্তির্যস্য প্রতিষ্ঠিতা শিবময়ী হৃন্মন্দিরে চিন্ময়ী।
ধ্যানং যস্য চ চিত্তশর্ম্মকরণং কর্ম্মান্তরোচ্ছেদকং
তং প্রীতিপ্রদমদ্য নো বিরহয়ন্ কালোঽসি নায়ার্থবান্ ॥
ত্যক্তস্বার্থোজগদুপকৃতা বর্পিতাত্মা মহাত্মা—
যুর্ব্বেদাধিং নিখিলসুতরং সংব্যধাৎ সংস্কৃতের্যঃ।
বিস্মর্ত্তুং তং কইহ সহসা স্যাৎক্ষমঃ সুর্ব্বভদ্রং
বাহোনাপি ক্ষণমপিবয়ং কেপুন র্নিত্যসঙ্গাঃ
যদ্যপ্যাসীৎ চিরমতিমতি র্বাহ্যবিত্তে সদীনঃ
জ্ঞানার্থানাং পুনরধিগমাৎ বস্তুতোঽভূন্মহাত্মা।
বিত্তাভাবাদপিপরিগতঃ ক্লেশমর্থোপলাভে
নারংসিষ্ট ক্ষণমপিকৃতী প্রেক্ষ্যকর্ত্তব্যবিঘ্নং ॥

অকৃতমলিনকর্ম্মা নিত্যশর্ম্মাত্মধর্ম্ম—
প্রবণহৃদয়বৃত্তিঃ কর্ম্মবীরঃ সুধীরঃ।
তনুজবদনুবোধী ছাত্রবর্গে স্বভাবাৎ
স্বহৃদি সুহৃদিনাসীদ্‌যশ্চসংভিন্নবোধঃ॥
আয়ান্তি যান্তি কতিকেপরিমান্তিলোকে
লোকান্ বৃথাত্তজনুষঃ ক্ষিতিভারভূতান্।
কিন্তু প্রিয়োত্তম ভবাদৃশ মর্ত্তরত্ন—
মায়াতি যাতিনসদা চিরদুর্লভং তৎ॥
লোকান্তরং যদিভবান্ বিধিসন্নিয়োগাৎ
প্রাপ্তোহস্তি সম্প্রতি সমর্জিতমাত্মপুণ্যৈঃ।
গাঢ়ানুরঞ্জনদৃশাং নন্বু নোহসমক্ষং
ন ত্বং তথাপ্যসি সুহৃৎ সুহৃদাং কদাপি॥
সুখেবা থদুঃখে স্ববাসে প্রবাসে
বয়ং যত্র তত্রস্থিতা যদ্বিধা বা।
চিরং ত্বাং নিজস্বং স্মরন্তোভবামঃ
কথঞ্চিদ্ ধরাবাসসংস্থাশ্চদুঃস্থাঃ॥
অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়োহয়ং
যস্তে সম্পৎ প্রাণতুল্যাসদাসীৎ।
হন্তাস্থাসৌত্বদ্বিযুক্তোনভাতি
চ্ছাত্রৈঃ সার্দ্ধং শোকসংক্ষুব্ধচিত্তৈঃ॥
বসুন্ধরেয়ং প্রিয়মাত্মসম্ভবং
বসুত্তমং ত্বাং পরিহায় দুঃস্থিতা।
নিজাভিধানস্য হতার্থতার্দ্দিতা
নরাজতে প্রাগিব সম্প্রতি প্রিয়॥
তত্তৎ সমৃদ্ধিপূর্ণাপি ত্বামৃতে কেবলং সুহৃৎ।
শূন্যায়তে ধরেয়ং নঃ ধন্যা প্রভাবিতা তব॥
পুণ্যাত্মন্ কৃতপুণ্যেন যা ত্বয়ার্জিতসদ্‌গতিঃ।
দদাতু সা চিরং শান্তিং তুভ্যমিত্যর্থয়ামহে॥
বিরজাচরণাম্বষ্ঠবংশদীপ মহোদয়।
অমর্ত্তলোকমাপন্নঃ লোকাতিরিক্তশক্তিকঃ॥
দেবভাবেন সন্দীপ্তঃ স্বার্জিতসুকৃতৈঃ কৃতী।
প্রভূয়াঃ প্রততং প্রাজ্ঞঃ প্রাগিবাস্মাসুপ্রীতিমান্।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস—মহাশয় নিম্নের শ্লোকটি সভাস্থলে রচনা করিয়া পাঠ করেন,—

বিরজা বিরজস্তমা নু বা
সুচরিং বিভবেষু নিঃস্পৃহতঃ
ব্রতমেকং দধদায়ুরাগমং।
কৃনু হন্ত গতঃসখে ভবান্॥

কয়েকজন ছাত্রও এই উপলক্ষে শোক-সূচক কয়েকটি গাথা পাঠ করিয়াছিল, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর আমরা প্রকাশ করিলাম না।

ফলকথা বিরজাচরণের জন্য ইদানীন্তন কালের রীত্যনুসারে সভাধিবেশনই হউক আর গীতি বা শ্লোকই বিরচিত হউক, ইঁহার অভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল—তাহা অবিসম্বাদিত।

ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।

(কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন)

প্রমেহে। (১) রক্তচন্দন ১ তোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১ তোলা—জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া—এই ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে প্রমেহ পীড়া আরোগ্য হয়। (২) কাঁচা হরিদ্রার রস অর্দ্ধ ছটাক—কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় সেবনে প্রমেহ নষ্ট হয়। (৩) দূর্ব্বা, কেশুর, মুথা, পানার মূল ডহরকরঞ্জা ও সেওলা—প্রত্যেক দ্রব্য ।/১০ সাড়ে পাঁচ আনা, জল /৷৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া—এই ক্বাথ পান করিলে শুক্রমেহ নষ্ট হয় (৪) আমলকীর রস দুই তোলা, মিছরি ।০ আনা—একত্র কয়েক দিন পান করিলে প্রমেহ আরোগ্য হয়। (৫) গাঁদা পাতার রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মিছরি সহ পান করিলে প্রস্রাব সরল হয় ও জ্বালা যন্ত্রণা বিদূরিত হয়।

দদ্রু রোগ।—(১) বন এলাইচ, সোহাগার খই ও নারিকেল তৈল একত্র মিলাইয়া মলমের মত করিয়া লাগাইলে যেরূপ দদ্রুই হউক না কেন—২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হয়। (২) তুলসী পাতা ও লবণ—একত্র পিষিয়া দদ্রু স্থানে লাগাইলে দদ্রু ভাল হয়। (৩) কনক ধুতুরার মূল ও শেফালিকা পাতা—কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া বা হরিদ্রা, হরিতাল, মুর্ব্বা ও সৈন্ধব—গোমূত্র দ্বারা বাটিয়া দদ্রুস্থানে লাগাইলে দদ্রু আরোগ্য হয়। (৪) সোহাগার খই, শ্বেত চন্দন সহ মিলাইয়া ঘুঁটের ছাই অথবা করবী বৃক্ষের কস্ লাগাইলেও দদ্রু আরোগ্য হয়। (৫) শ্বেতধুনা, সোহাগা, ফট্‌কিরি ও গন্ধক সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া কেরোসিন তৈল সহ মিশাইয়া ব্যবহার করিলে সকল প্রকার দদ্রু আরোগ্য হয়। (৬) সোহাগার খই ও কর্পূর—ঘৃতসহ পাক করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে। এই মলম ব্যবহারে কোঁচদাদ শীঘ্র আরোগ্য হয়।

কর্ণ রোগে।—(১) রসুন, আদা, সজিনার রস ঈষদুষ্ণ করতঃ কর্ণবিবরে প্রদানে কর্ণ বেদনা আরোগ্য হয়। (২) আকন্দের পীতবর্ণ পাকা পাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে ঝলসাইবে এবং ঐ রস নিঙড়াইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে কর্ণপূরণ করিবে। ইহাতে কর্ণশূল ও কর্ণ বেদনা নষ্ট হইবে। (৪) মালতী পত্রের রস—মধু সংযুক্ত করিয়া গরম করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কান পাকা আরোগ্য হয়।

চক্ষুর ছানিতে।—(১) শ্বেতপুনর্ণবার রস ও গব্য ঘৃত—সমপরিমাণে লইয়া

বেশ করিয়া মিশাইয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে ছানি কাটিয়া যায়। (২) আমরুল পাতার রস ও কর্পূর মিশাইয়া চক্ষুতে দিলে চক্ষু পরিষ্কার হয় ও ছানি পড়া ভাল হয়।

চক্ষু উঠায়।—(১) করবী ফুলের পাতা ছিঁড়িলে যে দুধের ন্যায় রস বাহির হয়, ঐ রস চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে চোখ্ উঠা আরোগ্য হয়। (২) ডাবের জল ফট্‌কিরির জল অথবা শামুকের পিঠ ভাঙ্গিলে যে জল বাহির হয়—ঐ জলে চক্ষু ধুইলে জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়া গিয়া চক্ষু উঠা আরোগ্য হয়। (৩) কাঁচা হরিদ্রার রসে রঙ্ করা ন্যাকড়া দিয়া সর্ব্বদা চক্ষু মুছিলে চোখ উঠা আরোগ্য হয়।

রাত কাণায়।—(১) পানের রস প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ৩।৪ ফোটা করিয়া দিলে রাতকাণা রোগের প্রতীকার ঘটে। (২) দধির সহিত গোল মরিচ ঘসিয়া অল্প মাত্রায় চক্ষুতে দিলে রাতকাণা রোগ অরোগ্য হয়। (৩) পানের সহিত জোনাকী পোকা সন্ধ্যা-বেলা সেবনেও উপকার হয়।

শিরোরোগে।—বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণ তিল সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শিরোরোগে উপকার দর্শে।

আধকপালে রোগে।—গুলঞ্চ রাস্না, বেড়েলা ঘৃত ও অগুরু একত্রে পেষণ করিয়া কপালে দিলে উপকার দর্শে।

রক্ত প্রদরে।—(১) দুই তোলা পরিমাণে দুর্ব্বার রসের সহিত ৩।৪ রতি পরিমাণ রসাঞ্জন ও ৮।১০ ফোঁটা মধু মিশাইয়া পান করিলে প্রবল রক্তস্রাব তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। (২) বেড়েলার মূল বাটিয়া দুই আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ছাগ দুগ্ধ ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তপ্রদর আরোগ্য হয়। (৩) রসাঞ্জন ও ন'টে শাকের মূল এক আনা পরিমাণে প্রত্যেকটি লইয়া চাউল ধোয়া জল সহ মিশ্রিত করিবে। উহা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে রক্ত প্রদরে বিশেষ উপকার দর্শে।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

বেরিবেরি।—বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনার মহাশয়ের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ,—স্থানে স্থানে বেরিবেরি, এপিডেমিক ডুপসি ও প্রবল ইডিমা ব্যাধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। যে সকল রেজিষ্টার ডাক্তার এই রোগের সংবাদ পাইবেন, তাঁহারা যেন স্বাস্থ্য কমিশনর মহাশয়কে সেই সংবাদ প্রদান করেন। এই রোগ কয়টির কারণ নির্ণয়ের জন্যও স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে চেষ্টা চলিতেছে। অবিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহারই ইহার কারণ কি না—সে সম্বন্ধেও তদন্ত চলিতেছে।

শিশু মঙ্গল প্রদর্শনী।—কলিকাতা সহরে শিশু মঙ্গল প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার জন্য এক কমিটিও গঠিত হইয়াছে। বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনর ডাক্তার বেণ্টলী ইহার সেক্রেটারী। ফলে স্বাস্থ্য কমিশনার মহাশয় এই উপলক্ষে শিশু মৃত্যু সংখ্যা যাহাতে বঙ্গদেশ হইতে হ্রাস পায়, তাহার উপায় প্রদর্শন করিবেন আশা করি।

হাসপাতালে ধর্ম্মঘট।—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ইডেন হাস-পাতাল, এজরা হাসপাতাল এবং প্রিন্সওব ওয়েলস হাসপাতালের কুলি এবং মেথরগণ বেতন বৃদ্ধির জন্য গত ৯ই মার্চ্চ ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছিল। প্রিন্সিপ্যাল কর্ণেল ডিয়ার সাহেব ইহাদিগকে শান্ত করার পর ইহারা আবার কার্য্যে যোগদান করিয়াছে। ধর্ম্ম ঘটের সময় হাসপাতালের নার্সগণই উহাদিগের কার্য্য করিয়াছিল। নার্সদিগকে ধন্যবাদ।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—বৈশাখ। | ৮ম সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

মস্তকের অস্থি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী. এম, এ, এল, এম, এস

মস্তকে মোট বাইশখানি অস্থি আছে। তন্মধ্যে আটখানি অস্থি দ্বারা করোটি বা শিরঃ-সম্পুট * নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই সম্পুটের মধ্যে জ্ঞানের প্রধান আধার মস্তিষ্ক অবস্থিতি করে। অবশিষ্ট চৌদ্দখানি অস্থি দ্বারা মুখমণ্ডল নির্ম্মিত হয়।

* ইং—Cranium—ক্রানিয়ম।

[বিংশ চিত্র—সমগ্র করোটি]

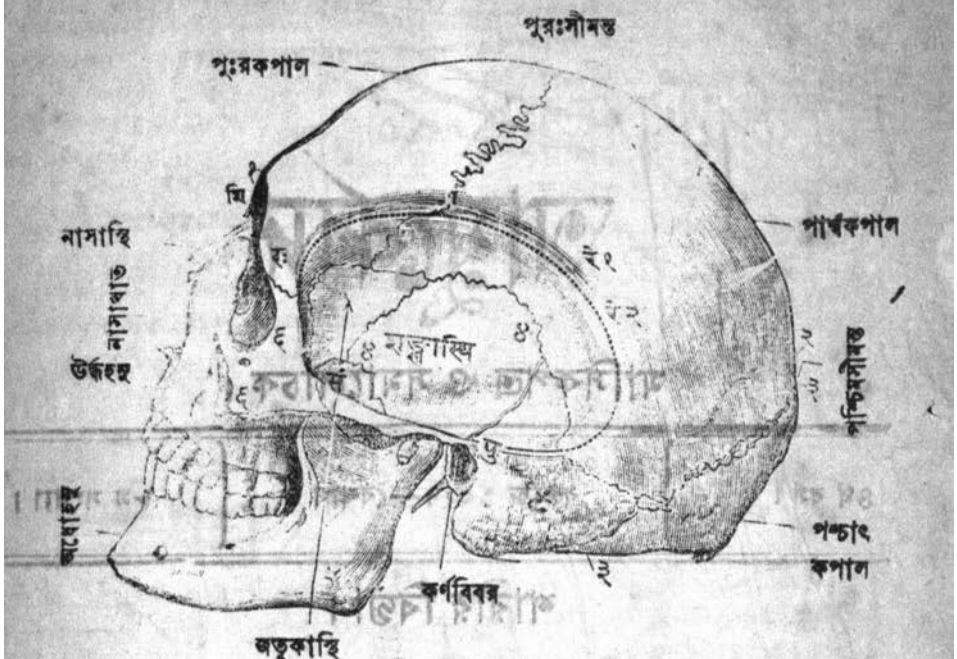

(১, ১) ১, ১—পুঃরকপাল। (২, ২) ২, ২—পার্শ্বকপাল। (৩, ৩) ৩, ৩—পশ্চাৎ কপাল। (৪, ৪) ৪, ৪—শঙ্খাস্থি (যুগ্ম অঙ্ক সীমা নির্দ্দেশের জন্য)। (৫) ৫—শঙ্খাস্থির গোস্তনাংশ। (৬, ৬) ৬, ৬—গণ্ডাস্থি। (ই ১) রে ১—উত্তরা শঙ্খতোরণিকা রেখা। (ই ২) রে ২—অধরা শঙ্খতোরণিকা। মধ্যে শঙ্খাচ্ছদা পেশীর উৎপত্তি স্থান।

দুই ভ্রূ জুড়িয়া উভয়দিকে পশ্চাদভিমুখে কর্ণমূলের উপর দিয়া কেশান্তভাগ পর্য্যন্ত দুইটী রেখা সংযুক্ত করিলে উহাদের ঊর্দ্ধাংশকে শিরঃ সম্পুট বলা যায়। শিরঃ- সম্পুট নির্ম্মাণ কারক আট খানি অস্থির নাম, যথা— পুরঃ কপাল একখানি, পশ্চাৎ কপাল একখানি, পার্শ্ব কপাল দুইখানি, কর্ণমূলে শঙ্খাস্থি দুইখানি এবং শিরঃসম্পুট ভূমিভূত জতুকা ও ঋর্ষ্বরক নামক অস্থি দুইখানি। এই আটখানি অস্থির মধ্যে ছয়-খানি কঙ্কালের বাহির হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। কেবল জতুকা ও ঋর্ষ্বর নামক অস্থি দুইখানি স্পষ্ট দেখা যায় না। বে জতুকাস্থির অংশমাত্র দেখা যায় (চিত্র দেখ)।

পশ্চাৎ কপাল*—চারিখানি শিরঃকপালের মধ্যে পশ্চিম কপাল পৃষ্ঠবংশের চূড়ার সহিত সংহিত হইয়া মস্তকের মূলবন্ধন স্বরূপ অবস্থিত। ইহা দুইভাগে বিভক্ত, যথা —কপালভাগ এবং মূলভাগ। কপালভাগ ঊর্দ্ধে পশ্চাতে হেলিয়া অবস্থিত এবং সর্পফণার ন্যায় আয়ত। মূলভাগ নিম্নদিকে সম্মুখে হেলিয়া অবস্থিত এবং সর্পগ্রীবা সদৃশ। উভয় ভাগের সংযোগে যে 'মহাবিবর' নির্ম্মিত

* Occipital Bone—অক্সিপিটাল্ বোন্।

হয় তাহার ভিতর দিয়া সশীর্ষ সুষুম্নাকাণ্ড নিম্নে পৃষ্ঠবংশের মধ্যে প্রবেশ করে। বাহ্য এবং আভ্যন্তর ভেদে পশ্চিম কপালের দুইটী তল আছে। তন্মধ্যে আভ্যন্তর তলের কপালভাগ মস্তিষ্কের পশ্চার্দ্ধ ও অনুমস্তিষ্ক ধারণার্থ খাতোদর। ইহাতে সিরা ধারণের জন্য চারিটী পরিখা স্বস্তিকাকারে অবস্থিত।

[২১শ চিত্র—পশ্চাৎ কপাল (সম্মুখতল)]

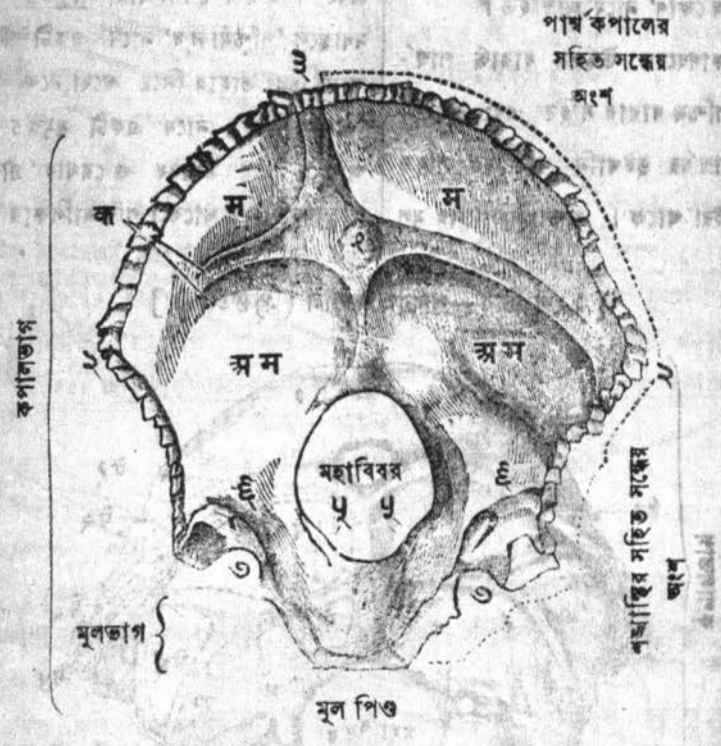

(জতুকাস্থির সহিত সন্ধেয়)

(১) ১—মহাবর্ত্ত। (২-২) ২, ২—পার্শ্বকোণদ্বয়। (২-১-২) ২-১-২—পার্শ্বকাখ্যসিরাপরিখা। (২) ৩—সম্মুখধারার মধ্যবিন্দু। (২-১-৪) ৩-১-৪—গীর্ষিকাখ্যা সিরাপরিখা। (৪, ৪) ৫, ৫—স্নায়ুসংযোগের জন্য দুইটী কলায়। (৫, ৫) ৬, ৬—মস্তাপ্রবর্দ্ধনদ্বয়। (৩, ৩)—অনুমস্তাখ্যাত দ্বয়। (ক) ক—কলাসংযোগসূচক পরিখাতদ্বয়।

এই সিরাপরিখা চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রকে 'মহাবর্ত্ত' বলে। প্রত্যেক সিরাপরিখার উভয় তটে 'মস্তিষ্কাবরণী' কলার অংশ বিশেষ সংলগ্ন থাকে। আভ্যন্তর তলের মূলভাগেও সামান্য খাত আছে, উহা সুষুম্নাশীর্ষক ধারণের জন্য। কপালভাগ ও মূলভাগের সংযোগ স্থলের বহিঃসীমায় দুইদিকে দুইটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার ক্ষুদ্র গভীর খাত আছে। উক্ত খাতদ্বয়ে 'অনুমস্তা' নামক স্থূল সিরাদ্বয় অবস্থিতি করে বলিয়া উহারা 'অনুমস্তাখাত' নামে অভিহিত।

উক্ত খাত-দ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধিত অংশদ্বয়কে "মস্তা প্রবর্দ্ধনক" বলে।

কপাল ভাগের ধারা অত্যন্ত দন্তুর এবং উভয় দিগের ধারার দুই পার্শ্বে দুইটী কোণ আছে, ইহারা 'পার্শ্বকোণ' নামে অভিহিত।

পার্শ্বকোণদ্বয়ের উর্দ্ধতন ধারার্দ্ধ পার্শ্ব-কপালের পশ্চিম ধারার সহিত এবং অধস্তন অংশের পার্শ্বদ্বয় দুইখানি শঙ্খাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। পশ্চাৎ কপালের মূল ভাগের মধ্যস্থ 'মূলপিণ্ড' নামক অংশ জতুকা স্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হয়।

পশ্চাৎ কপালের বহিস্তলের ঊর্দ্ধদিকের কপালাংশ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং 'শিরশ্ছদা' পেশী দ্বারা আবৃত। ইহার মধ্যস্থলে 'পশ্চিমার্ব্বুদ' নামে একটী উৎসেধ আছে এবং তাহার নিম্নে অধোদিকে বিস্তৃত 'পশ্চিমালিকা' নামে একটী সমুন্নত রেখা আছে। এই উৎসেধ ও রেখায় 'গ্রীবাধরা স্নায়ুরজ্জু' সংলগ্ন থাকে। পশ্চিমালিকার উভয়-

[২২শ চিত্র—পশ্চাৎ কপাল (পৃষ্ঠতল)]

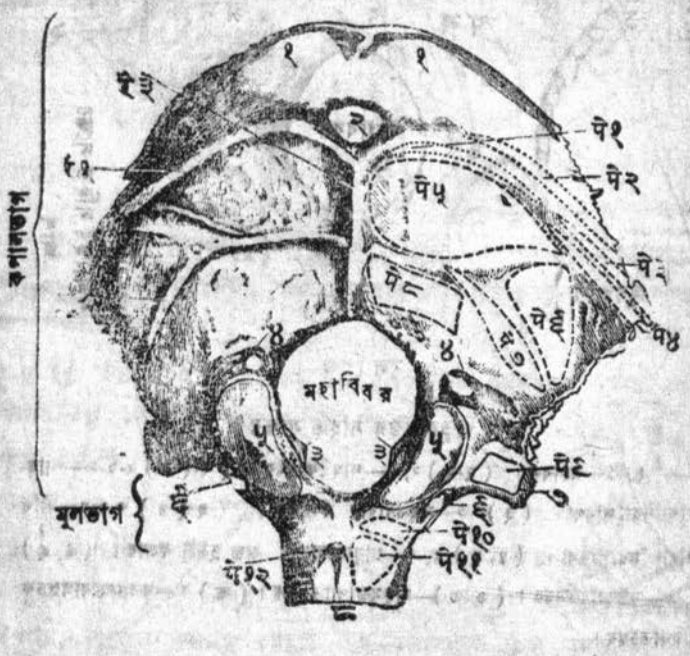

(১, ১) ১, ১—পৃষ্ঠতলের মৃদু মসৃণ ভাগ, ইহা শিরশ্ছদা পেশীদ্বারা আবৃত থাকে। (২) ২—পশ্চিমার্ব্বুদ। (৩, ৩) ৩, ৩—স্নায়ু সংযোগের জন্য কলায়ক-দ্বয়। (৪, ৪)—মূলকোটির পশ্চাতের ছিদ্রদ্বয়। (৫, ৫) ৫, ৫—মূলকোটিদ্বয় (৬, ৬) ৬, ৬—মূলকোটির সম্মুখস্থ রন্ধ্রদ্বয়। (৭, ৭) ৭, ৭—মস্তাপ্রবর্দ্ধনদ্বয়। (৮) ৮—মূলপিণ্ড। (২১) রে ১—উত্তরতোরণিকা। (২২) রে ২—অধর তোরণিকা। (পে) পে—চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীনিবেশ স্থল। পেশ্যধ্যায়ে বর্ণনীয়।

দিকে দুইটী করিয়া চারিটী তোরণাকার রেখা আছে। ইহাদের উপরের দুইটীকে 'উত্তরতোরণিকা' এবং নিম্নের দুইটীকে 'অধরতোরণিকা' বলে। পশ্চাৎ কপালের মূলভাগের উপরিস্থ অংশে বহিস্তলে শিম-বীজের ন্যায় যে দুইটী উৎসেধ আছে, উহাদিগকে 'মূলকোটি' বলে। 'চূড়াবলয়া' কশেরুকার উপরিস্থিত স্থালকদ্বয়ের সহিত মূলকোটিদ্বয়ের সন্ধি হইয়া থাকে। মূলকোটিদ্বয়ের অন্তঃপার্শ্বে 'কলায়ক' নামক উৎসেধ দুইটীর সহিত 'মধ্যরজ্জু' নামক স্নায়ু সংবদ্ধ থাকে। মূলকোটিদ্বয়ের সম্মুখে ও পশ্চাতে দুই দুইটী করিয়া চারিটী "রন্ধ্রমার্গ" আছে। এইরন্ধ্রমার্গের ভিতর দিয়া নাড়ী প্রবেশ করিয়া থাকে।

সন্ধি—পশ্চাৎকপাল ছয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা, ঊর্দ্ধ দিকের অর্দ্ধভাগ দুই পার্শ্বে দুই খানি পার্শ্ব কপালের সহিত, অধোদিকের অর্দ্ধভাগ দুই পার্শ্বে দুই খানি শঙ্খাস্থির সহিত, মূলের অগ্রভাগ জতুকাস্থির সহিত এবং মূলকোটিদ্বয় চূড়াবলয়ার সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

পেশী—পশ্চাৎ কপালে বারো জোড়া পেশী সংযুক্ত থাকে; উত্তর তোরণিকার উপ কণ্ঠে তিন জোড়া, উভয় তোরণিকার অন্তরালে তিন জোড়া, অধর তোরণিকার নিম্নভাগে তিন জোড়া এবং মূলভাগে তিন জোড়া।

পার্শ্বকপাল *—(২৩শ চিত্র) পুরঃকপাল এবং পশ্চিমকপালের মধ্যে দুই-

[[২৩শ চিত্র—পার্শ্বকপাল (অভ্যন্তর তল)]]

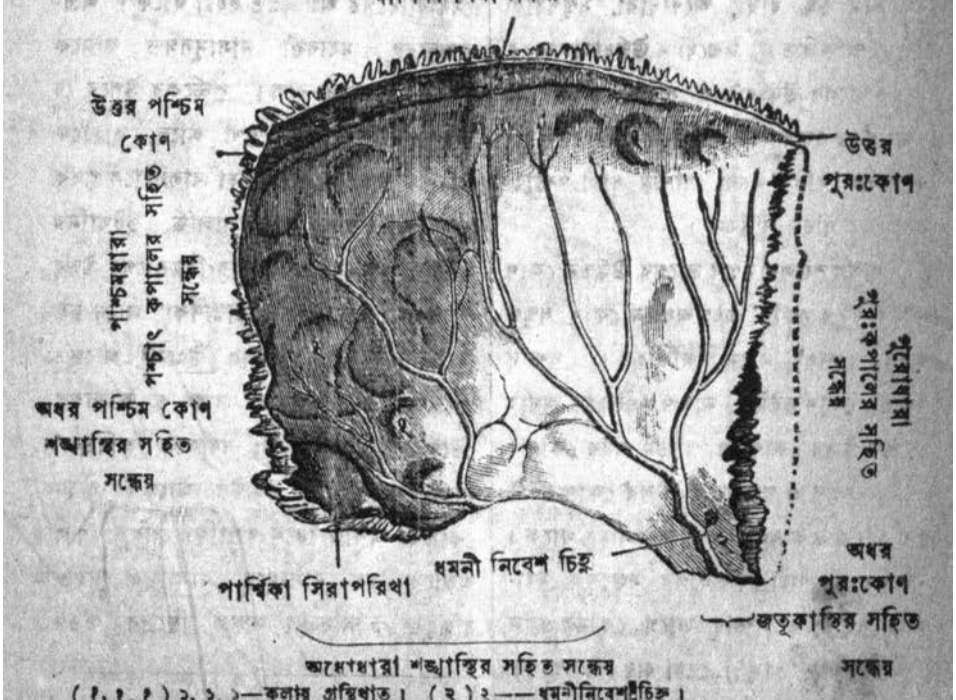

(১.১.১) ১, ১—কলার গ্রন্থিঘাত। (২) ২—ধমনীনিবেশচিহ্ন।

* Parietal Bones প্যারাটাইল বোন্‌স্।

দিকে দুই খানি পার্শ্বকপাল আছে। ইহাদের চারিটী ধারা, চারিটী কোণ এবং বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুইটী তল আছে।

ইহাদের বহিস্তল কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় আকার বিশিষ্ট এবং বহিস্তলে 'পার্শ্বকুম্ভ' নামে পিণ্ডাকার দুইটী উৎসেধ এবং 'উত্তরশঙ্খতোরণিকা' ও 'অধরশঙ্খতোরণিকা' নামে ধনুকের ন্যায় বক্রাকার দুইটী রেখা আছে। অধর শঙ্খতোরণিকা রেখার ক্রোড় দেশ হইতে 'শঙ্খচ্ছদা' পেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পার্শ্বকপালদ্বয়ের আভ্যন্তর তল খাতোদর এবং উচ্চাবচ। উক্ত খাতের মধ্যে মস্তিষ্ক-কলাপোষণী মধ্যমা ধমনীর শাখাপ্রশাখা-জালের এবং কলাগ্রন্থি সমূহের নিবেশ চিহ্ন দেখা যায়।

পার্শ্বকপালের চারিটী ধারা দন্তুর এবং যথাক্রমে ঊর্দ্ধ ধারা, অধোধারা, সম্মুখধারা নামে অভিহিত। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধধারা অপর পার্শ্বকপালের ঊর্দ্ধ ধারার সহিত, অধোধারা শঙ্খাস্থি ও জতূকাস্থির সহিত, সম্মুখধারা পুরঃকপালের সহিত এবং পশ্চিম ধারা পশ্চাৎকপালের সহিত সন্ধিযুক্ত।

পার্শ্বকপালের সম্মুখ ভাগের ঊর্দ্ধতন কোণ 'সম্মুখ উত্তর কোণ' এবং অধস্তন কোণ 'সম্মুখ অধর কোণ' নামে অভিহিত। পশ্চাদ্ ভাগের কোণ দুইটীর নামও এইরূপ অর্থাৎ 'পশ্চিম উত্তর কোণ' ও 'পশ্চিম অধর কোণ'। তন্মধ্যে সম্মুখ ও পশ্চাতের উত্তর কোণ দুইটী জন্ম হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত কলাময় থাকে। এই জন্য স্তন্যপায়ী শিশুদিগের মস্তকের মধ্যস্থলে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ ভাগে কোমল স্থান (চলিত কথায় 'তালু',) দেখা যায়। সম্মুখের অধরকোণ ধমনী-ধারণের জন্য খাঁজবিশিষ্ট এবং জতূকাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। পশ্চাতের অধরকোণ পার্শ্বিকাখ্য সিরা ধারণের জন্য খাঁজবিশিষ্ট এবং শঙ্খাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

সন্ধি—পাঁচটী অস্থির সহিত (চিত্র দেখ)।

পুরঃকপাল বা অগ্রকপাল* —(২৪শ চিত্র) ইহা শিরঃসম্পুটের সম্মুখ ভাগ নির্ম্মাপক বৃহৎ ঝিনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট কপালাস্থি। ইহার দুইটী অংশ যথা, 'ললাট ভাগ' এবং 'নেত্রচ্ছদি ভাগ'। তন্মধ্যে ললাট ভাগ—তিন খানি ফলক দ্বারা নির্ম্মিত—মধ্যে ললাটফলক এবং উভয় পার্শ্বে দুইখানি পার্শ্বফলক। ললাটফলকের বহিস্তল কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় আকার বিশিষ্ট এবং উহার দুই পার্শ্বে 'অগ্রকুম্ভ' নামে দুইটী উৎসেধ আছে। এই অগ্রকুম্ভদ্বয় মেধাবীদিগের অত্যুন্নত এবং অল্প মেধাবীদিগের অল্প উন্নত হইয়া থাকে। অগ্রকুম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নাসামূলগত স্থানকে 'কূর্চ্চক' বা ভ্রূমধ্য বলে। কূর্চ্চকের উপরে যে ঊর্দ্ধগত নাতিপরিস্ফুট রেখা আছে, তাহাকে 'গূঢ়সীমন্তিকা' বলে। উহা বাল্যকালে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত পুরঃকপালার্দ্ধ দুইখানির সংযোগ চিহ্ন। এই রেখার নিম্নভাগের উভয় পার্শ্বে ভ্রূর অনুক্রমে 'ভ্রূতোরণিকা' নামে দুই দিকে দুইটী তোরণাকার উৎসেধ আছে। প্রত্যেক ভ্রূতোরণিকার বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুইটি কোটি এবং মধ্যস্থলে 'অধিভ্রুব' নামে সূক্ষ্ম ছিদ্র বা কোটর আছে। বাহ্যকোটিদ্বয় অপাঙ্গ দেশে গণ্ডাস্থির সহিত এবং অন্তঃকোটিদ্বয় নাসামূলে নাসাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। অধিভ্রুব নামক ছিদ্রের ভিতর

---

* ইং—Frontal Bone—ফ্রণ্ট্যাল্ বোন্।

[২৪শ চিত্র—পুরঃকপাল]

অস্তস্তল

(বুঝিবার সুবিধার জন্য উত্তান অধোমুখ)

দীর্ঘকাখ্য সিরাপরিখা

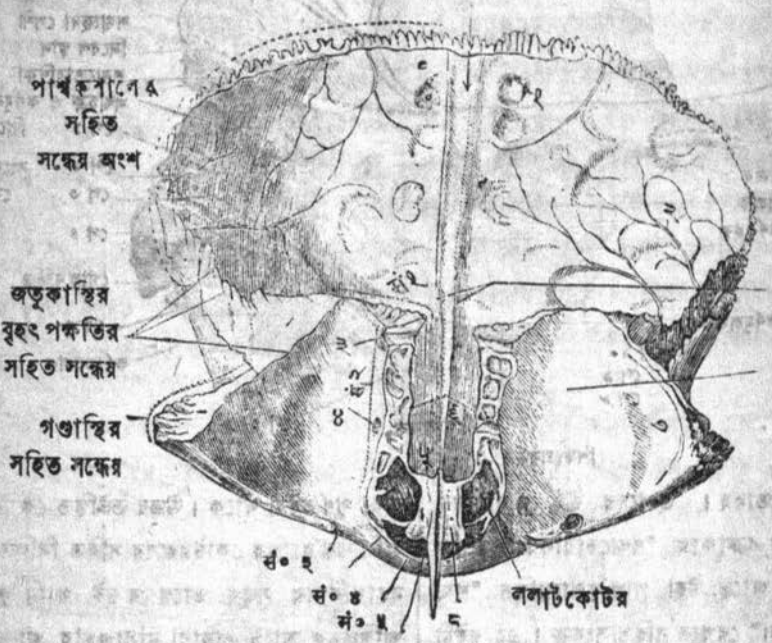

(১) ১—কলাগ্রন্থিখাত। (২) ২—ধমনী প্রতানাঙ্ক। (৩, ৪) ৩, ৪—ঋক্ষরকোটর। (৫) ৫—মহাপরিখা। (৬) ৬—মহাপরিখাতটদ্বয়। (৭) ৭—অশ্রুগ্রন্থিখাত। (৮) ৮—নাসাগুহার ছাদ নির্ম্মাপক ক্ষুদ্র ফলক। (৯) ৯—সিরা পরিখাতট। (সং০ ১) সং ১—জতুকাস্থির লঘুপক্ষতির সহিত সন্ধেয় অংশ। (সং০ ২) সং ২—ঋক্ষরাস্থির পার্শ্বের সহিত সন্ধেয় অংশ। (সং০ ৩) সং ৩—অশ্রুপীঠাস্থির সহিত সন্ধেয় অংশ (সং০ ৪) সং ৪—উর্দ্ধহনুস্থির সহিত সন্ধেয় অংশ। (সং০ ৫) সং ৫—নাসাস্থির সহিত সন্ধেয় অংশ। (সং০ ৬) সং ৬—ঋক্ষরাস্থির মধ্যফলকের সহিত সন্ধের অংশ।

দিয়া ঐ নামের সিরা ধমনী ও নাড়ী নির্গত হইয়া থাকে। ভ্রূতোরণিকাদ্বয়ের পশ্চাতে অস্থির অভ্যন্তরে গূঢ় ভাবে অবস্থিত 'ললাট কোটর' নামে দুই দিকে দুইটি কোটর আছে, উহারা নাসাগুহার সহিত সংযুক্ত।

ললাট ফলকের অস্তস্তল খাতোদর এবং এই খাত কলাগ্রন্থি ও ধমনীপ্রতান সমূহের ধারণকৃত চিহ্নবিশিষ্ট। অস্তস্তলের মধ্যভাগে সিরাপরিখা আছে এবং এই পরিখার তটে মস্তিষ্কচ্ছদা কলার "দাত্রিক" নামক মধ্যভাগ সংযুক্ত থাকে।

পার্শ্বফলকদ্বয় শঙ্খচ্ছদা পেশী ধারণের জন্য

[২৫শ চিত্র—শঙ্খাস্থি (বহিস্তল)]

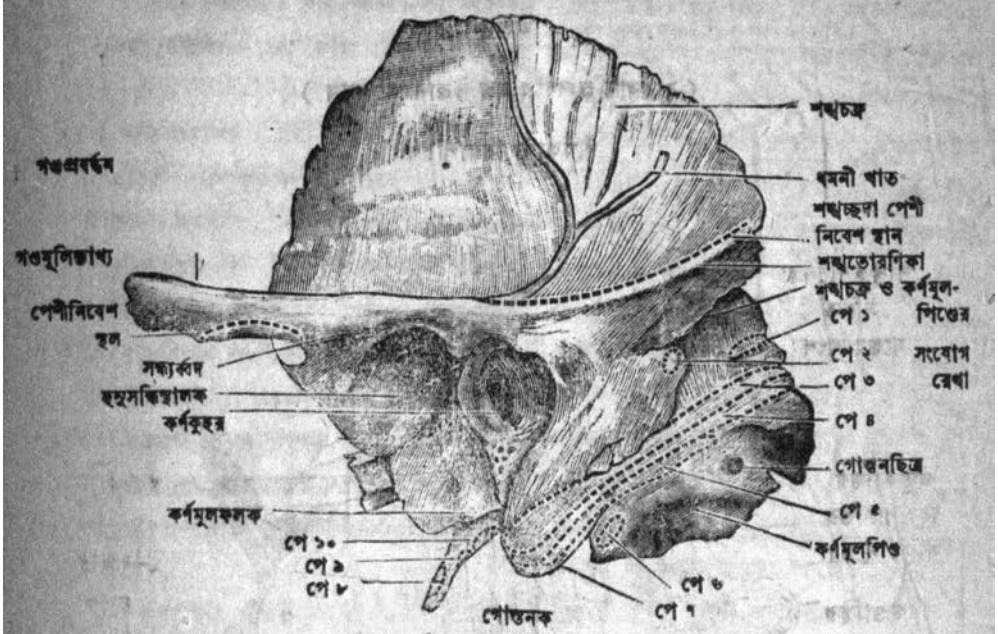

ঈষৎ খাতোদর। উহাদের ঊর্দ্ধ সীমায় ধনুকের ন্যায় বক্রাকার "শঙ্খতোরণিকা" নামে যে রেখা আছে, উহা পার্শ্বকপালাস্থির "শঙ্খতোরণিকা" রেখার সহিত সংযুক্ত। এই দুইটী রেখার পাশে পাশে বহু পেশী সংলগ্ন থাকে।

পুরঃকপালের নেত্রচ্ছদিভাগ দুইটী চক্ষুর উপর ছাদের ন্যায় অবস্থিত। এই অংশ—'নেত্রচ্ছদিফলক' নামক পার্শ্বস্থিত অংশদ্বয়ে বিভক্ত। দুইটি নেত্রচ্ছদি ফলকের মধ্যভাগে 'মহাপরিখা' নামে খাত আছে। নেত্রচ্ছদিফলকদ্বয় প্রায় ত্রিকোণ, মসৃণ এবং ঈষৎ খাতোদর। প্রত্যেক ফলকের বহিঃসীমায় অশ্রুগ্রন্থি ধারণের জন্য ক্ষুদ্র অগভীর কোটর আছে।

মহাপরিখায় দুই তটের মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থানে ঘর্ঘরক অস্থির চালনীপটল নামক অংশের দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে। উভয় তটস্থিত কোটরগুলি ঝর্ঝরাস্থির কোটরদ্বয়ের সহিত মিলিত। মহাপরিখার সম্মুখ ভাগে যে দুই খানি ক্ষুদ্র অস্থিফলক আছে তাহারা নাসাগুহার আচ্ছাদন স্বরূপ হইয়া থাকে। এই দুই খানি ফলকের মধ্যে 'অগ্রকণ্টক' নামে যে সূক্ষ্ম কণ্টকাকার অংশ আছে, উহা সম্মুখভাগে নাসাস্থি-দ্বয়ের সহিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত। উক্ত অস্থিফলক দুইখানির দুই পার্শ্বে দুইটী ললাট কোটরের দ্বার আছে।

সন্ধি—পুরঃকপালের এক এক অর্দ্ধ ভাগ সাতখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা,—মহাপরিখার বহিঃসীমায় চারিটির সহিত অর্থাৎ সম্মুখ ভাগে নাসাস্থি, ঊর্দ্ধে হনুস্থি ও অশ্রুপীঠাস্থির সহিত এবং পশ্চাদ্